(কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
ইসলামী আদব-শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য নিয়ে রচিত)

ইসলামী জীবন-ধারা

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
(আলোচক, পিস টিভি বাংলা)

الآداب الإسلامية

جمع وترتيب:

عبد الحميد الفيضي

আব্দুল হামীদ ফাইযী

'ইসলামী জীবন-ধারা'য় চলতে একান্ত আগ্রহী
পরম শ্রদ্ধেয় ভাই মাষ্টার

সাহেবের হাতে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদব আছে, তেমনি আছে সাংসারিক আদব, দাম্পত্যের আদব, সামাজিক ও বৈয়াক্তিক আদব। আছে দৈনন্দীন জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপের সরল ও সুন্দর আদব। 'ইসলামী জীবন-ধারা' কত যে সৌন্দর্য ও সভ্যতাময় তা ইসলামের বৈয়াক্তিক জীবনের পরিচ্ছন্নতার কথাগুলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'ইসলামী জীবন-ধারা'য় প্রতিপালিত কোন মুসলিম বেআদব ও অসভ্য হতে পারে না। পারে না উগ্র ও বদ-মেজাজ হতে। শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও বাআদব মানুষটি হবে সমগ্র মানবিক গুণে গুণান্বিত। যেহেতু তার পথপ্রদর্শক ছিলেন সুমহান চরিত্রের সুউচ্চ শিখরে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃতি হল খোদ সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি।

ইসলামী আদবী যিন্দেগীর বক্ষ্যমাণ এই পুস্তিকাতে জীবনের কেবল কয়েকটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু আমার অন্যান্য পুস্তিকায় জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তাই চেষ্টা করেছি, যাতে 'ইসলামী জীবন-ধারা'র সকল দিকটাই অতি সংক্ষেপে হলেও বাংলাভাষী মুসলিমদের মনে-প্রাণে আলোকপাত করে যেতে পারি।

জীবনের পিপাসা অনন্ত, সময়কাল অতি অল্প। না জানি দেখতে দেখতে কখন নিভে যাবে জীবনের বাতি। হয়তো মিটবে না সে পিপাসা, পূরণ হবে না সে আশা। হয়তো হিংসা ও সমালোচনার ঝটিকায় হারিয়ে যাবে উদ্যমের সে ভাষা। হয়তো পাব না সে জীবনের বাআদব সাথী-সঙ্গী; যারা উৎসাহ দিয়ে প্রবল উদ্দীপনায় 'ইসলামী জীবন-ধারা'কে নির্দ্বিধায় বরণ করে নেবে।

আমি আশা করি সকল মানুষের কাছে, তারা যেন অন্যায় ও অনাচারের সূর্যতপ্ত এই পৃথিবীর তাপে দগ্ধ না হয়ে ইসলামের এই সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুক। 'ইসল খ বন-ধারা'র নির্ঝরের সুশীতল পানি পান করে প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠুক সকলের মন ও প্রাণ।

আল্লাহর কাছে সেই আশা করি, সেই আবেদন রাখি। নিশ্চয় তিনি আবেদন মঞ্জুরকারী প্রজ্ঞাময়।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে 'ইসলামী জীবন-ধারা'য় চলার মত প্রয়াস দান কর। শক্তি ও প্রেরণা দাও ইসলামের সৌন্দর্যকে বিকাশ করার মত। আমীন।

আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
রবিউল আওয়াল ১৪২৬হিঃ

পানাহারের আদব

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হল খাদ্য ও পানীয়। জীবন ধারণের জন্য এই খাদ্য হালাল হতে হবে মুসলিমের।

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ ﴾

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!' কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।" *(দারেমী ২৬৭৪ নং)* "--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

পানাহারের বিভিন্ন আদব রয়েছে ইসলামে। যে সকল আদব পালন করলে মানুষের চরিত্র ও সুস্বাস্থ্য গড়ে ওঠে। সেই আদবের কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। সোনা-চাঁদির পাত্রে খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু এ হল অহংকারী কাফেরদের পাত্র। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কারণ, তা

দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।” *(বুখারী ৫৬৩৩, মুসলিম ২০৬৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি (সোনা)-চাঁদির পাত্রে পান-(আহার) করে, আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ করে পান-(আহার) করে।” *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫নং)*

২। অমুসলিমদের পাত্রে (তাদের দোকান ও হোটেলে) খাওয়া নিষেধ। তবে তাদের পাত্র (দোকান বা হোটেল) ছাড়া যদি মুসলিমদের কোন পাত্র (দোকান বা হোটেল) না পাওয়া যায়, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় তাদের সেই পাত্র (ধোয়ার পর তাদের দোকান বা হোটেলে) খাওয়ার অনুমতি আছে। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৩০নং প্রমুখ)*

৩। ঠেস বা হেলান দিয়ে খাওয়া মকরূহ। মহানবী ﷺ বলেন, “আমি হেলান দিয়ে খাই না।” *(আহমাদ ১৮২৭৯, বুখারী ৫৩৯৯ প্রমুখ)* তিনি হেলান দিয়ে খেতে নিষেধও করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১২২নং)*

যেভাবে খেলে হেলান দিয়ে খাওয়া হয়, সেইভাবে খাওয়া মকরূহ। দেওয়াল বা চেয়ারের সাথে পিঠের অথবা মাটির সাথে বাম হাতের হেলান দিয়ে খাওয়া অপছন্দনীয়। যেহেতু অনুরূপ বসা বিনয়ীদের লক্ষণ নয় এবং হেলান দিয়ে খেলে বেশী খাওয়া হয়। আর বেশী খাওয়া ইসলামে বাঞ্ছনীয় নয়।

উবুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া নিষেধ। *(আবূ দাউদ ৩৭৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৭০নং)*

সুতরাং খেতে বসার সঠিক ও সুন্নতী বৈঠক হল নিম্নরূপ ঃ-

(ক) দুই হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর (নামায পড়ার মত) বসা। অনুরূপ খেতে বসে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, “আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা বানিয়েছেন এবং অহংকারী ও উদ্ধত বানাননি।” *(আবূ দাউদ ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ ৩২৬৩নং)*

(খ) উভয় পায়ের রলাকে খাড়া রেখে উভয় পাছার উপর বসা। মহানবী ﷺ এরূপ বসে খেজুর খেয়েছেন। *(মুসলিম ২০৪৪নং প্রমুখ)*

ডান পা-কে খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসে খাওয়া চলে। *(ফতহুল বারী ৯/৪৫২)* অবশ্য এরূপ বসে খাওয়া সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

সতর্কতার বিষয় যে, দুই পা-কে গুটিয়ে আড়াআড়িভাবে রেখে হাঁটু ভাঁজ করে (বাবু হয়ে) বসে খাওয়াকেও অনেকে হেলান দিয়ে খাওয়ার মধ্যে গণ্য করেছেন। *(শারহুন নাওয়াবী ১৩/২২৭)* অবশ্য অসুবিধার কারণে অথবা কাপড় খারাপ হওয়ার ভয়ে সেভাবে বসে খাওয়া হারামও নয়।

৪। খাবার সময় খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে এবং নামাযের সময় এসে উপস্থিত হলে আগে খাবার খান, তারপর নামাযে যান। যাতে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট না হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “নামাযের ইকামত হলে এবং রাতের খানা উপস্থিত হলে,

আগে খানা খেয়ে নাও।” *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে’ ৩৭৪নং)* ইবনে উমার ﷺ বলেন, ‘যখন কেউ খেতে বসবে তখন খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত সে যেন তাড়াহুড়া না করে; যদিও নামাযের ইকামত হয়ে যায় তবুও।’ *(বাইহাক্বী)*

৫। খাবার শুরু করার আগে ও পরে উভয় হাতকে ধুয়ে নিন। অবশ্য এ কেবল আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য। নচেৎ খাবার আগে হাত ধোয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২১৪)*

অবশ্য খাবার পর হাত ধোয়ার ব্যাপারটাও প্রকৃতিগত রুচির ব্যাপার। তবুও ইসলামে এর নির্দেশ এসেছে। খোদ মহানবী ﷺ খাবার পরে কুল্লি করেছেন এবং হাত ধুয়েছেন। *(আহমাদ ২৭৪৮৬, ইবনে মাজাহ ৪৯৩নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি হাতে গোশ্তের গন্ধ ও চর্বি না ধুয়ে তা নিয়েই ঘুমায়, অতঃপর কোন বিপদ ঘটে, তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ না করে।” *(আহমাদ ৭৫১৫, আবূ দাউদ ৩৮৫২, তিরমিযী ১৮৬০, ইবনে মাজাহ ৩২৯৭, দারেমী ২০৬৩নং)*

এখানে কোন বিপদ বলতে, হাত না ধুয়ে শোওয়ার ফলে চর্বির গন্ধে আরশোলা, ইঁদুর বা অন্য কোন প্রাণী হাত বা আঙ্গুল কাটতে বা কামড়াতে পারে। তাছাড়া এতে কোন রোগ বা শয়তানী স্পর্শ হওয়ারও কারণ থাকতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি আপনি নাপাক অবস্থায় গোসল করার আগে খাবার খেতে চান, তাহলে আপনার জন্য ওযূ মুস্তাহাব। আল্লাহর নবী ﷺ নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে অথবা ঘুমাতে চাইলে আগে ওযূ করে নিতেন। *(বুখারী ২৮৬, মুসলিম ৩০৫নং, প্রমুখ)* অবশ্য কেবল হাত ধুয়ে খাওয়াও চলবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নাপাকে থেকে যখন ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন ওযূ করে নিতেন এবং যখন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন দুই হাত ধুয়ে নিতেন। *(আহমাদ ২৪৩৫৩, নাসাঈ ২৫৬নং)*

৬। খাবার শুরু করার আগে ‘বিসমিল্লাহ’ বলুন এবং শেষ করার পর আল্লাহর প্রশংসা করুন।

এই আদব পালনে খাবার ঠিকমত দেহে কাজ করা এবং তার অপকারিতা দূর করার ব্যাপারে বড় প্রভাব রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন, খাবারে ৪টি জিনিস জমা হলে সে খাবার পরিপূর্ণ হয়; খাবার আগে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা, (একাধিক লোকের) অনেক হাত পড়া এবং তা হালাল হওয়া। *(যাদুল মাআদ ৪/২৩২)*

আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব ও শরীক হওয়া থেকে বাঁচা যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই শয়তান (মুসলিমের) খাবার খেতে সক্ষম হয়; যদি খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ না বলা হয়।---” *(মুসলিম ২০১৭, আবূ দাউদ ৩৭৬৬নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং

খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫নং)*

বলা বাহুল্য, খাবার শুরুতে কেবল 'বিসমিল্লাহ'ই বলবেন। তার সঙ্গে 'আর-রাহমানির রাহীম' যোগ করবেন না। যেহেতু তার কোন দলীল নেই।

পক্ষান্তরে শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে কেউ তা বলতে ভুলে গেলে সে যেন (মনে পড়লে বা) শেষে বলে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআ-খিরাহ।" *(আবূ দাউদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮নং)*

খাবার সময় আরো মান্য আদব এই যে, খাবার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা নির্দিষ্ট দুআ পড়তে হয়। যেমনঃ- (ক)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِّنْهُ۔

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি অআত্বইমনা খাইরাম মিন্হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম আহার দান কর।

(খ) খাবার দুধ হলে বলুন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ۔

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক-লানা ফীহি অযিদনা মিন্হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দান কর এবং আমাদেরকে এর প্রাচুর্য দাও। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৮)*

(গ) এই দুআটি পাঠ করলে পূর্বেকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৯)*

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةً۔

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা ক্বুউওয়াহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই।

অন্যান্য আরো দুআ দুআর বই-এ দেখুন। তবে সতর্কতার বিষয় যে, খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে যে দুআ পড়বেন, তার অর্থ যেন বুঝেন।

নচেৎ আপনার মনে সেই প্রশংসা ও শুক্র স্থান না পেলে মুখে মন্ত্র আওড়িয়ে লাভ কি?

খাবার খেতে খেতে মাঝে মাঝে অথবা প্রত্যেক লোকমা খাওয়ার শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলার স্পষ্ট দলীল নেই। অবশ্য অনেকে সেই হাদীসকে এর দলীল মনে করেন, যাতে মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, বান্দা খাবার খেয়ে তার উপর তাঁর প্রশংসা করুক এবং পানীয় পান করে তার উপর তাঁর প্রশংসা করুক।" *(মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬নং, নাসাঈ)*

এখানে 'খাবার ও পানীয়' বলতে এক সময়ের খাবার বা পানীয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক লোকমাও বুঝা যেতে পারে। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৩৭)* অল্লাহু আ'লাম।

৭। পানাহার করুন ডান হাতে। দুই হাতে খাবার ধরতে হলেও একটার পর একটা ডান হাতে নিয়েই খান। বাম হাতে খাবেন না। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।"

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমার ﵁ এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (রঃ) দুটি কথা আরো বেশী বলতেন, "কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপ তার দ্বারা কিছু প্রদানও না করে।" *(মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৮০০, মালেক, আবূ দাউদ ৩৭৭৬ নং)*

উমার বিন আবী সালামাহ ﵁ বলেন, আমি শিশুবেলায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কোলে (বসে খাবার সময়) আমার হাত পাত্রের যেখানে-সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বললেন, "ওহে বৎস! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের তরফে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম ২০২২নং)*

একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট বাম হাত দিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, "তুমি ডান হাত দিয়ে খাও।" সে বলল, 'আমি পারি না।' রসূল ﷺ বললেন, "তুমি যেন না পার। অহংকারই ওকে (আদেশ পালনে বিরত রেখেছে)।" সালামাহ বলেন, 'সুতরাং (এই বদ্দুআর ফলে) সে আর তার হাতকে মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।' *(মুসলিম ২০২১নং)*

কিন্তু যার ডান হাত নেই অথবা ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই সে নিরুপায় হয়েই বাম হাত ব্যবহার করবে।

৮। খাবার (এক শ্রেণীর হলে) পাত্রের এক ধার থেকে খান, নিজের তরফ থেকে খান। খাবার পাত্রের মাঝখান হতে খাওয়া উচিত নয়। কারণ, মহানবী ﷺ উমার বিন আবী সালামাহ ﵁-কে বলেছিলেন, "ওহে বৎস! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের তরফে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম ২০২২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন পাত্রের উপর (মাঝখান) থেকে না খায়। বরং পাত্রের নিচে (একধার) থেকে খায়। কারণ বর্কত তার উপর (মাঝখান) অংশে নাযিল হয়।" *(আহমাদ ২৪৩৫, আবূ দাঊদ ৩৭৭২, তিরমিযী ১৮০৫, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭, দারেমী ২০৪৬নং)*

৯। সুন্নত হল তিনটি আঙ্গুল (বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা (রুটি, খেজুর প্রভৃতি) খাবার খাওয়া। আল্লাহর রসূল ﷺ তিনটে আঙ্গুল দিয়েই খাবার খেতেন। *(আহমাদ ২৬৬২৬, মুসলিম ২০৩২, আবূ দাঊদ ৩৮৪৮, দারেমী ২০৩৩নং)*

১০। খাবার শেষে আঙ্গুল ও প্লেট চেঁটে খান। তারপর মুছে অথবা ধুয়ে ফেলেন। মহানবী ﷺ এরূপই করতেন এবং এরূপ করতে অপরকে আদেশ করতেন। তিনি ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন তার আঙ্গুল চেঁটে বা চাঁটিয়ে না নেওয়ার আগে তা না মুছে (বা না ধোয়)।" *(বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১নং, প্রমুখ)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, "নবী ﷺ আঙ্গুল ও প্লেটকে চেঁটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, কোন খাবারে বর্কত আছে।" *(আহমাদ ১৩৮০৯, মুসলিম ২০৩৩, ইবনে মাজাহ ৩২৭০নং)* এক বর্ণনায় আছে যে, শেষের খাবারে বর্কত নিহিত আছে। *(আবূ আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ১৩৪৩নং, ইরওয়াউল গালীল ৭/৩২)*

খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেঁটে খাওয়ার গুরুত্ব বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। কারণ, আঙ্গুলের মাথা হতে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, যা খাদ্য হজম হওয়াতে সাহায্য করে। আর এ জন্যই তরকারীতে আঙ্গুল ডোবালে তরকারী খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য যে, প্লেট চেঁটে খেলে প্লেট দুআ বা ইস্তিগফার করে এ ধারণা শুদ্ধ নয়। কারণ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। *(যয়ীফুল জামে' ৫৪৭৮-নং)*

১১। খাদ্যাংশ নিচে পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলা কর্তব্য। কারণ, তাতেই বর্কত নিহিত থাকতে পারে। সুতরাং তা কুড়িয়ে না খেলে বর্কত চলে যাবে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো খাবারের লোকমা হাত হতে (পাত্রের বাইরে) পড়ে গেলে (এবং তাতে ময়লা লেগে গেলে) তার ময়লা দূর করে সে যেন তা খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। খাবার শেষে সে যেন নিজের আঙ্গুলগুলো চেঁটে খায়। কারণ তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(আহমাদ ১৪২১৮, মুসলিম ২০৩৪নং)*

তদনুরূপ পানীয়তে (পানি, শরবত, জুস বা চায়ে) যদি মাছি পড়ে যায়, তাহলে সেটিকে সরাসরি না তুলে পূর্ণরূপে তাতে ডুবিয়ে, অতঃপর তা তুলে ফেলে পান করা কর্তব্য। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যাবে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। কারণ,

তার দুটি ডানার মধ্যে একটিতে রোগজীবাণু আছে আর অপরটিতে আছে রোগমুক্তি। (পানীয় বস্তুতে পড়ে যাওয়া অবস্থায়) মাছি যে ডানাতে রোগজীবাণু আছে সেটিকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অতএব তা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার পর নিক্ষেপ করা উচিত।” *(বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

১২। খাবার জিনিস গরম থাকলে খেতে শুরু না করে খাবার মত ঠান্ডা হলে খেতে শুরু করুন। কারণ বেশী গরম খাবার খেলে জিভ বা মুখে কষ্ট পেতে পারেন, খাবারের আসল স্বাদ জিভে অনুভব করতে পারবেন না, বেশী গরম গিলে ফেললে আপনার পেটেরও কোন ক্ষতি হতে পারে। আর তখন আপনি ঐ খাবারের কোন বর্কত পাবেন না।

এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেন, “(খাবারের বেশী গরমভাব দূর করে খেলে) তা বর্কতে বেশী বড় হয়।” *(আহমাদ ২৬৪১৮, দারেমী ২০৪৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৯২নং)*

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, ‘ভাপ না চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়।’ *(বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১৯৭৮নং)*

১৩। খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁ দিয়ে খাবেন না। গরম খাবার ঠান্ডা করার জন্য অথবা পানীয়তে কোন পোকা বা কুটা দূর করার জন্য ফুঁক দিবেন না। আহার্য বা পানপাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়বেন না। যেহেতু তাতে খাদ্য ও পানীয়র সাথে আপনার ছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিলিত হবে। সে দূষিত গ্যাস আপনার শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কিছু পান করবে, তখন সে যেন পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে অথবা ফুঁ না দেয়।” *(বুখারী ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, আবূ দাউদ ৩৭২৮, তিরমিযী ১৮৮৮, ইবনে মাজাহ ৩৪২৯নং)*

তিনি খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৬৯১৩নং)*

১৪। খাবার যেমনই হোক তার কোন দোষ বর্ণনা করতে হয় না। খাদ্যের কোন প্রকার ত্রুটি বর্ণনা না করে তা ভালো লাগলে খান, না লাগলে ছেড়ে দিন। যেহেতু তাতে রাঁধুনীর মন ছোট হয়।

মহানবী ﷺ কখনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। কিছু খেতে ইচ্ছা হলে খেতেন, না হলে তা বর্জন করতেন। *(বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪নং প্রমুখ)*

১৫। পানি কখনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন না; বরং বসে বসে পান করবেন। কোন খাবার খাওয়ার সময়ও বসে বসে খাবেন দাঁড়িয়ে খাবেন না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে।” *(মুসলিম ২০২৬নং)*

আনাস ؓ বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না

করে। আনাস ﷺ-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।" *(মুসলিম ২০২৪নং)*

কিন্তু বসার জায়গা না থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধায় বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম নয়। যেহেতু দাঁড়িয়ে পান বৈধ হওয়ার হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৫, মুসলিম ২০২৭, ইবনে মাজাহ ৩৩০১নং প্রমুখ)*

১৬। এক নিঃশ্বাসে পানি পান না করে অন্ততঃ তিন নিঃশ্বাসে পান করবেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, "এতে বেশী তৃপ্তি আসে বা পিপাসা নিবারণ হয়, পিপাসার কষ্ট থেকে অথবা কোন ব্যাধি সৃষ্টির হাত থেকে বেশী পরিমাণে বাঁচা যায় এবং হজম, পরিপাক ও দেহের উপকার বেশী হয়।" *(বুখারী, মুসলিম ২০২৮নং প্রমুখ)*

তবে তার মানে এই নয় যে, এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা বৈধ নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, এক নিঃশ্বাসে পান করার চাইতে তিন নিঃশ্বাসে পান করা উত্তম এবং তার উপকারিতার কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

১৭। সরাসরি মশক বা কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ এভাবে পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৫৬২৭, ৫৬২৯, মুসলিম ১৬০৯নং প্রমুখ)*

বুঝতেই তো পারছেন, এভাবে পানি পান করলে গোটা মশক বা কলসীর পানি নোংরা হয়ে যাবে, মশক বা কলসীর ভিতরে কোন কুটা বা পোকা থাকলে তা আপনার পেটে চলে যেতে পারে এবং এইভাবে গোটা মশক বা কলসীর পানি এঁটো করলে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু একাধিক মানুষের মাঝে সংক্রমণ করতে পারে।

১৮। আপনি যদি অপরকে পানাহার করান, তাহলে আদব ও মুস্তাহাব হল যে, আপনি সবার শেষে খাবেন। আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপ করেছেন এবং বলেছেন, "যে লোকদেরকে পানি পান করায়, সে যেন সবের শেষে পান করে।" *(মুসলিম ৬৮১নং প্রমুখ)*

১৯। খেতে খেতে কথা বলা নিষেধ নয়। কথা বলতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন যাতে গল্প বলতে বলতে আপনার ভাগ অন্যে না মেরে দেয়। আসলে 'খেতে খেতে কথা বলতে নেই' এ কথা মায়েরা শিশুদেরকে তাড়াতাড়ি খাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বলে থাকেন। এটা কোন শরয়ী নির্দেশ নয়।

২০। জামাআতবদ্ধভাবে এক পাত্রে খাওয়া মুস্তাহাব। খাবার কম থাকলেও তাতে বর্কত হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট।" *(মুসলিম ২০৫৯নং প্রমুখ)*

তিনি বলেন, "তোমরা এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক খেয়ো না। একজনের খাবার ২ জনের জন্য যথেষ্ট।" *(ইবনে মাজাহ ৩২৮৬, সহীহুল জামে' ৪৫০০নং)*

একদা সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। (তার কারণ কি?)' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথক খাও।" তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তোমরা খাবারে এক সাথে বস এবং আল্লাহর নাম নাও, তাহলে তোমাদের খাবারে বর্কত হবে।" *(আহমাদ ১৫৬৪৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ ৩২৮৬, সহীহুল জামে' ১৪২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় খাবার হল সেই খাবার, যার উপর অনেক হাত পড়ে।" *(সহীহুল জামে' ১৭১নং)*

পক্ষান্তরে একাকী পৃথক পৃথকভাবে খাওয়াও বৈধ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই।" *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

২১। অপর মুসলিমের সাথে খেতে এঁটো খাওয়া দূষণীয় নয়। এতে কোন মুসলিমের অকারণে ঘৃণা হওয়াও উচিত নয়। কারণ, মহানবী ﷺ সহ সাহাবীগণ একপাত্রেই পানাহার করেছেন। বিশেষ করে স্ত্রীর এঁটো খেতে অরুচি হওয়া উচিত নয় কোন স্বামীর। যেহেতু সকল মানুষের জন্য আদর্শ স্বামী মহানবী ﷺ নিজ স্ত্রীর (মাসিক অবস্থাতেও) এঁটো খেয়েছেন। বরং মা আয়েশা পানপাত্রের যে জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, তিনিও সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পান করতেন। যে হাড় থেকে হযরত আয়েশা গোশ্ত্ ছাড়িয়ে খেতেন, সেই হাড় নিয়েই ঠিক সেই জায়গাতেই মুখ রেখে আল্লাহর নবী ﷺ গোশ্ত্ ছাড়িয়ে খেতেন। *(আহমাদ, মুসলিম ৩০০নং, প্রভৃতি)*

২২। এক পাত্রে একাধিক লোক খেলে খাবার সময় মনের ভিতর হিংসা রাখবেন না। সবার চেয়ে আপনি বেশী খাবেন -এ সংকল্প করবেন না। মনে মনে সবার চেয়ে আপনি কম খাবেন এ নিয়ত, ইচ্ছা ও চেষ্টা যদি না-ই রাখতে পারেন, তাহলে সকলের সমান খাবেন -এ নিয়ত যেন অবশ্যই রাখেন। খাবার সময় ভালো জিনিসটি আগে-ভাগে তুলে খাবেন না। বড় বড় লোকমা ধরবেন না। একটির জায়গায় দুটি এক সাথে কিছু তুলে খাবেন না। স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করে ঘন ঘন গ্রাস তুলবেন না।

যেহেতু মহানবী ﷺ সঙ্গীর অনুমতি ছাড়া এক সঙ্গে দুটি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ২৪৫৫, মুসলিম ২০৪৫নং, প্রমুখ)*

২৩। যদি আপনাকে কেউ খেতে ডাকে এবং আপনার পেটে ক্ষুধা ও মনে খাবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তা গোপন করে মিথ্যা ওযর পেশ করবেন না। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭২৩০নং)*

২৪। আপনার খানা যদি খাদেম প্রস্তুত করে, তাহলে সেই খাবারে খাদেমকেও শরীক করুন। যেহেতু সে ঐ খাবারের পিছনে মেহনত করেছে, তার সুগন্ধ তার পেটে গেছে

এবং হয়তো বা তার মন ঐ খাবারের প্রতি লোভাতুর হয়েছে। এই জন্যই দয়ার নবী ﷺ-এর নির্দেশ হল, তাকে বসিয়ে এক সাথে খান। আর তাকে বসানো যদি সম্ভব না হয় বা সে বসতে না চায়, তাহলে সেই খাবার হতে কিছু অংশ তুলে তাকে দিয়ে খান। *(বুখারী ৫৪৬০, মুসলিম ১৬৬৩নং)*

২৫। এমন টেবিল, দস্তরখান বা মজলিসে বসে খাবেন না, যে মজলিসে মদ বা অন্য কোন হারাম জিনিস খাওয়া হয়। সে ভোজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না, যে ভোজ অনুষ্ঠানে কোন নোংরা জিনিস করা বা দেখানো হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ-মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, আদাবুয যিফাফ ১৬৩- ১৬৪ পৃঃ) (মেহমান নেওয়াযীর আদব দ্রঃ)*

২৬। জামাআতে সবারই খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাবার হতে হাত না তোলা, উঠে না যাওয়া এবং বসে থেকে খাওয়ার ভান করার ব্যাপারে (ইবনে মাজাহর) হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৩৮-২৩৯নং)* সুতরাং এ আদবকে সুন্নত জ্ঞান করা ঠিক নয়।

২৭। জুতো পায়ে রেখে খাওয়া অবৈধ নয়। জুতো খুলে খাওয়ার হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৯৮০নং)*

২৮। পেটুকদের মত ভরপেট এত খাওয়া খাবেন না, যাতে নড়তেই না পারেন। বেশী খেলে পেটের রোগ হতে পারে, শরীর ভারী হতে পারে এবং তাতে ইবাদতে আলস্য সৃষ্টি হতে পারে। আর বেশী খেলে আপনার হৃদয়ও কঠোর হতে পারে। তাছাড়া বেশী বেশী খাওয়া আসলে কাফেরদের অভ্যাস। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর নির্দেশমত খান, তাহলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।" *(বুখারী ৫৩৯৬, মুসলিম ২০৬২নং, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১২১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

পক্ষান্তরে এত কমও খাবেন না, যাতে শরীরই ভেঙ্গে যায়। যেহেতু স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইবাদতেও দুর্বলতা আসবে। সুতরাং পানাহারের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন; ভালো থাকবেন।

২৯। খাবার পর দাঁতে লেগে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খিলাল করে ছাড়িয়ে ফেলুন।

যেহেতু তার ফলে দাঁতের রোগ হতে পারে এবং তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের খিলালকারীগণ উত্তম (বা প্রশংসনীয়)।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৬৭নং)* ইবনে উমার বলেন, 'যে খিলাল ত্যাগ করে, তার দাঁত দুর্বল হয়ে যায়।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইরওয়াউল গালীল ১৯৭৪নং)*

প্রস্রাব-পায়খানার আদব

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার নাম। প্রস্রাব-পায়খানা ও বাতকর্ম থেকে রাজকর্ম পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষা রয়েছে তাতে। ইসলামে রয়েছে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দর সামাজিকতার বিধান। ইসলামের নবী ﷺ মুসলিমদেরকে সে সবের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একজন মুসলিমকে কিভাবে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র ও আদর্শ মানুষ হতে হবে, তার খুঁটিনাটি বিষয় তিনি বিবৃত করে গেছেন।

আসুন আমরা সেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করিঃ-

১। যেখানে মানুষে গন্ধ পাবে, যেখানে মানুষের পায়ে লাগবে, যেখানে মানুষ গালি ও অভিশাপ দেবে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করবেন না। যেমনঃ রাস্তায়, ঘাটে, যে গাছের ছায়ায় লোকেরা বসে সে গাছের ছায়ায়, ফলদার গাছের নিচে, যেখানে লোকেরা জমায়েত হয়ে কেনা-বেচা করে অথবা রোদ পোহায় সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা চলবে না।

তদনুরূপ সাধারণ পায়খানা ঘরে প্রস্রাব-পায়খানা করে পানি না দিয়ে নোংরা করে রাখাও বৈধ নয়। বৈধ নয় বাড়ির ভিতরকার নোংরা পানি রাস্তায় ছাড়া।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ।" লোকেরা বলল, 'দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম কি, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "লোকেদের রাস্তায় ও ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা।" *(মুসলিম ২৬৯নং, আবূ দাউদ ২৫নং, প্রমুখ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

যেমন তিনি মসজিদের দরজায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৮১৩ নং)*

প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে না কবরস্থানে। *(ইবনে মাজাহ ১৫৬৭নং)* যেহেতু কবরবাসীর প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করা মুসলিমের কর্তব্য; যেমন কবরের উপর জুতো পরে চলা নিষিদ্ধ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সামর্থ্য থাকলে বাড়ির ভিতরে বাথরুম করা ওয়াজেব। যাতে বহু ইজ্জতও বাঁচবে এবং বহু রোগ-জীবাণুর হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

২। বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ। *(মুসলিম ২৮১নং প্রমুখ)* যেমন পুকুর, হওয, ঝিল, খাল প্রভৃতিতে প্রস্রাব করা যাবে না। পায়খানা তো মোটেই না। সুতরাং বাথরুমের পাইপও এ সবের পানিতে নামানো যাবে না। বিশেষ করে তার ফলে যদি পানির ত্রিগুণ রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সে পানি নাপাকে পরিণত হয়ে যাবে।

৩। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা বা ঘরে এমন কোন জিনিস নিয়ে প্রবেশ করবেন না, যাতে মহান আল্লাহর নাম উল্লেখ আছে। আল্লাহর নামের তা'যীম যথাসাধ্য করা অবশ্যই উচিত। অবশ্য যা না নিয়ে ঢুকলে অন্য কোন উপায় থাকে না, তার কথা ভিন্ন। *(আল-মুমতে' ১/৯১)*

৪। প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পশ্চাৎ করে বসবেন না। আল্লাহর নবী ﷺ এ কাজ করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

আবূ আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পায়খানা করার সময়ে তোমরা কিবলাকে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ করে বসো না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসো।" *(বুখারী ১৪৪, মুসলিম ২৬৪নং)*

বলাই বাহুল্য যে, আমাদের দেশে কিবলার দিক পশ্চিমে। অতএব আমাদেরকে উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসতে হবে।

পক্ষান্তরে কিবলার তা'যীম প্রদর্শন করলে সওয়াবও রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কিবলামুখে অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুন একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৪৫নং)*

প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মাকদিস বা মাসজিদুল আকসার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ নয়।

৫। অধিকাংশ খবীস জিনরা নোংরা স্থানে বাস করে বা আসে যায়। আর শয়তান হল মানুষের চিরশত্রু। শয়তান মানুষকে বেইজ্জত করতে চায়, বেআবরু দেখতে পছন্দ করে। কিন্তু প্রস্রাবাগার বা পায়খানা ঘরে বা স্থানে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়লে আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায়। *(তিরমিযী ৬০৬, ইবনে মাজাহ ২৯৭নং)* অতঃপর শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে নিম্নের দুআ পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুষি অল খাবা-ইষ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবীস জিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৬। প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় পর্দা জরুরী। এ জন্য বাড়ির ভিতরে বাথরুম হওয়া খুবই দরকার। অবশ্য বাইরে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হলে এমন জায়গায় বসতে হবে যেখানে কেউ যেন দেখতে না পায়। কোন উঁচু জায়গা, ঝোপের আড়াল বা রাতের অন্ধকার যেন আপনাকে গোপন করে নেয়।

ইসলামী শরীয়তে ইজ্জত ও শরমগাহের যথার্থ হিফাযত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পুরুষ ছাড়া বিশেষ করে মহিলাদের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয়। মহানবী ﷺ যখন নিজ প্রয়োজনে যেতেন তখন অনেক দূরে যেতেন এবং লোকচক্ষু থেকে নিজেকে গোপন করে নিতেন। *(বুখারী ৩৬৩, মুসলিম ২৭৪নং প্রমুখ)*

৭। দেহ বা কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগা থেকে সতর্ক হওয়া জরুরী। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হত না--।" *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে।" *(দারাকুত্বনী, সহীহ তারগীব ১৫১ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের (ছিটা গায়ে লাগার) কারণে হবে।" *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৫৩ নং)*

সুতরাং পেশাব করতে এমন জায়গায় বা এমনভাবে বসবেন না, যাতে তার ছিটা ঘুরে আপনার দেহ বা কাপড়ে না লাগে। অতএব উঁচু জায়গায় বসে নিচু জায়গায় পেশাব করুন, যেদিক থেকে জোর হাওয়া বইছে তার বিপরীত দিকে (কিবলা না হলে) বসে পেশাব করুন। পাথরের উপর না করে নরম জায়গায় পেশাব করুন তাহলে ছিটা লাগার আশঙ্কা থাকবে না।

যেমন বিপদের আশঙ্কা আছে বলে কোন ফাটল বা গর্তে পেশাব-পায়খানা করবেন না।

আর ছিটা লাগার আশঙ্কা আছে বলেই অপ্রয়োজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা বিশ্বাস করো না। যেহেতু তিনি বসে বসেই পেশাব করতেন।' *(তিরমিযী ১২, নাসাঈ ২৯, ইবনে মাজাহ ৩০৭নং)*

অবশ্য তিনি প্রয়োজনে দাঁড়িয়েও পেশাব করেছেন। *(বুখারী ২২৫, মুসলিম ২৭৩নং প্রমুখ)*

অতএব আপনিও প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারেন। তবে শর্ত হল, যেন আপনার শরমগাহ কেউ দেখে না ফেলে এবং আপনার কাপড়ে যেন পেশাবের ছিটা না লাগে।

৮। প্রস্রাব-পায়খানার কাজে বাম হাত ব্যবহার করুন। লেনদেন ও পানাহার করা এবং পবিত্র ও রুচিকর জিনিস ধারণ করার জন্য ডান হাত, আর পবিত্রতা অর্জন করা এবং অপবিত্র ও ঘৃণিত জিনিস ধারণ করার জন্য বাম হাত ব্যবহারই মানুষের প্রকৃতি ও রুচিসম্মত কাজ।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব করবে, তখন সে যেন নিজ লিঙ্গ ডান হাত দ্বারা না ধরে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা (প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার) না করে ---।" "প্রস্রাব করার সময় তোমাদের কেউ যেন নিজ লিঙ্গ ডান হাত দ্বারা অবশ্যই না ধরে এবং ডান হাত দ্বারা যেন পায়খানা পরিষ্কার না করে--।" *(বুখারী ১৫৩, মুসলিম ২৬৭ সুনান আরবাআহ প্রমুখ)*

৯। যেমন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়, তেমনি প্রয়োজনে মাটির ঢেলা ইত্যাদি দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন হয়। মহানবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনের জন্য মাটির ঢেলা ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি কেবল পানিই ব্যবহার করেছেন। ঢেলার থেকে পানি ব্যবহারে অধিক পবিত্রতা আছে। কুবাবাসীগণ পবিত্রতায় পানি ব্যবহার করতেন বলে মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। *(ইরওয়াউল গালীল ৪৫নং)* পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ অথবা কুবাবাসীগণ এক সাথে ঢিল ও পানি ব্যবহার করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস নেই।

অবশ্য মাটির ঢেলা না পাওয়া গেলে পাথর, টিসু ইত্যাদি দ্বারাও প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করা যায়। তবে পশুর হাড় ও (শুষ্ক) গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষিদ্ধ। কারণ তাতে পবিত্রকরণের বৈশিষ্ট্য নেই অথবা তা জিন জাতির খাদ্য।

তদনুরূপ মানুষের খাদ্যকেও প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহার করা যাবে না কোন এমন কাগজকে, যাতে কোন তা'যীমযোগ্য কথা লিখা আছে।

১০। ঢেলা ব্যবহারকালে (একটি বা দুটিতে পরিষ্কার হয়ে গেলেও) কমসে কম তিনটি ঢেলা ব্যবহার করতে হবে। তিনটির বেশী প্রয়োজন হলে বেজোড় (৫ বা ৭টি) ঢেলা ব্যবহার বিধেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম ঢেলা দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার না করে।" *(আহমাদ ২৩১৯১, মুসলিম ২৬২নং, সুনানে আরবাআহ)*

"তোমাদের কেউ যখন (প্রস্রাব-পায়খানার পর) ঢেলা ব্যবহার করে, তখন সে যেন

বেজোড় ঢেলা ব্যবহার করে।” *(বুখারী ১৬১, মুসলিম ২৩৭ প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, প্রস্রাব-পায়খানার পর সরাসরি হাত যাতে পায়খানায় না লাগে সেই ভয়ে মাঠে ঢিল ব্যবহার করে পায়খানা মুছে নেওয়ার পর পানি দিয়ে পায়খানাদ্বার ধুয়ে ফেলা দূষণীয় নয়। দূষণীয় ও অতিরঞ্জন হল, পানি থাকা সত্ত্বেও তা বাথরুমের ভিতরেও জরুরী মনে করা, এ কাজের জন্য স্পেশালভাবে ঢেলা প্রস্তুত করে মার্বেল পাথরের বাথরুমের ভিতরেও ব্যবহার করা। তদনুরূপ অতিরঞ্জন ও বিদআত হল লোকের সামনেও শরমের মাথা খেয়ে শরমগাহে ঢিল লাগিয়ে ধরে থেকে ৪০ কদম হেঁটে বেড়ানো।

১১। প্রস্রাব-পায়খানা করা অবস্থায় দুই জনের লজ্জাস্থান খুলে রেখে কথা বলা উচিত নয়। যেহেতু তাতে মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৫৫- ১৫৬নং)*

১২। প্রস্রাব-পায়খানা ঘরে প্রবেশ করার সয়ম বাম পা আগে বাড়ানো এবং সেখান হতে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করা বিধেয় হওয়ার কোন দলীল নেই। অবশ্য কিয়াস ব্যবহার করে অনেকে এটিকে বিধেয় মনে করেন। যেহেতু ভালো জায়গা মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে বাড়াতে হয় এবং সেখান হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করতে হয়। সুতরাং খারাপ জায়গায় প্রবেশ ও সেখান হতে বের হওয়ার সময় তার বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। *(আল-মুমতে’ ১/৮৫)*

১৩। তদনুরূপ প্রস্রাব-পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভরনা দিয়ে বসার হাদীস সহীহ নয়। *(ঐ ১/৮৬)*

১৪। জুতা পরে, মাথা ঢেকে পায়খানা ঘরে প্রবেশ করার হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪১৯২নং)* অবশ্য নোংরা জায়গায় জুতা পরে যাওয়া তো প্রকৃতিগত ব্যাপার।

১৫। প্রস্রাব-পায়খানা করা কালে হাঁচি হলে অথবা আযান শুনলে মুখে আল্লাহর যিক্র করা যাবে না। অবশ্য মনে মনে করতে পারা যায়।

১৬। প্রস্রাব-পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে নিম্নের দুআ পড়তে হয়।

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই। *(আহমাদ ২৪৬৯৪, আবু দাউদ ৩০, তিরমিযী ৭, ইবনে মাজাহ ৩০০নং)*

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দুআ (اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي)র হাদীসটি যয়ীফ। *(ইরওয়াউল গালীল ৫৩, যয়ীফুল জামে’ ৪৩৭৮নং)*

বেশভূষার আদব

ইসলাম যেমন মুসলিমের আভ্যন্তরিক দিক পবিত্র করার তাকীদ দেয়, ঠিক তেমনিই তাকীদ দেয় তার বাহ্যিক দিকটাও পবিত্র ও সুন্দর করার।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম মানুষের শরমগাহ ঢাকাকে ফরয ঘোষণা করেছে। সুতরাং কোন মুসলিম একাকী থাকলেও উলঙ্গ থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (الأعراف ٢٦)

"হে মানব জাতি! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে লেবাস দিয়েছি। পরন্তু 'তাকওয়া'র লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

মুমিন বান্দাগণের গুণ বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٣٠ ﴾ (المعارج ٢٩-٣٠)

অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা তিরস্কৃত নয়। *(সূরা মুমিনূন ৫-৬, সূরা মাআরিজ ২৯-৩০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য মানুষ থেকে নিজের শরমগাহ হিফাযত কর। নিজেদের আপোসে থাকলেও যথাসাধ্য তা কাউকে দেখাবে না এবং একাকী নির্জনে থাকলেও (উলঙ্গ থাকবে না। কারণ) মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" *(আবূ দাউদ ৪০১৭, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনে মাজাহ ১৯২০নং)*

শরীয়তের দৃষ্টিতে "(পুরুষের) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান হল লজ্জাস্থান।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৫৮৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোন জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৪০ নং)*

অন্যত্র বলেন, "তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থান।"

(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৯০৬ নং)

যেহেতু গোসল করার সময় শরমগাহ প্রকাশ পাওয়ার ভয় থাকে, তাই সেই সময়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে শরীয়ত আমাদেরকে নির্দেশ দেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ অতি লজ্জাশীল ও গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ গোসল করলে সে যেন পর্দা করে নেয়।" *(আহমাদ ১৭৫০৯, আবূ দাউদ ৪০১২, নাসাঈ ৪০৬নং)*

আর সে জন্যই ফাঁকা পুকুর, নদী বা সমুদ্রঘাটে গোসল করা বৈধ নয়। বরং যেমনই হোক বিশেষ করে মহিলাদের জন্য বাড়িতে বাথরুম করা একান্ত জরুরী।

শরীয়তের সভ্য-দৃষ্টিতে সাধারণভাবে লেবাসের কতকগুলি শর্ত ও আদব রয়েছে; যা পালন করতে মুসলিম নরনারী বাধ্য।

জ্ঞাতব্য যে, শরীয়তে মহিলাদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ- [১]

১। লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোন বেগানা (যার সাথে কোনও সময়ে বিবাহ বৈধ এমন) পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেন না মহানবী ﷺ বলেন, "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়---।" *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা ওড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!' *(আবূ দাউদ ৪১০১ নং)*

আল্লাহ তাআলার আদেশ, মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক)

---

[১] *উল্লেখিত শর্তাবলী আমার একাধিক পুস্তিকায় বিবৃত হয়েছে। শরীয়তী লেবাস সম্পর্কীয় বিষয়টি আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব না পেলে এ পুস্তকে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতাম না।*

ঢেকেছিল।' *(আবূ দাঊদ ৪১০২নং)*

সাহাবাদের মহিলাগণ যখন পথে চলতেন, তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গের কাপড়ের শেষ প্রান্ত মাটির উপর ছেঁচড়ে যেত। নাপাক জায়গাতে চলার সময়েও তাদের কেউই পায়ের পাতা বের করতেন না। *(মিশকাত ৫০৪, ৫১২, ৪৩৩৫ নং)* সুতরাং মাথা ও পায়ের মধ্যবর্তী কোন অঙ্গ যে প্রকাশ করাই যাবে না, তা অনুমেয়।

জ্ঞাতব্য যে, মহিলাদের পায়ের পাতা গোপন করা অনেকের মতে জরুরী না হলেও উত্তম অবশ্যই বটে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে মোজা ও জুতার মাধ্যমে তা পর্দা করে নিলেও চলবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩৮)*

২। যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "সাধারণতঃ যা প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া তারা যেন তাদের অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, যে বোরকা সৌন্দর্যখচিত, সে বোরকাকেও আর একটি বোরকা দিয়ে ঢাকা জরুরী।

৩। লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে এক হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত আসমা (রাঃ)কে সতর্ক করেছিলেন। *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৩৭২ নং)*

একদা হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি তার ওড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। *(মালেক, মিশকাত ৪৩৭৫ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। ---(এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলাদল, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উঁটের কুঁজের মত হবে। তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৩৭৯৯নং)*

৪। পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

৫। যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সেন্ট্ বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ১০৬৫নং)*

সেন্ট্ ব্যবহার করে মহিলা মসজিদেও যেতে পারে না। একদা চাশ্তের সময় আবূ হুরাইরা ﵁ মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।' *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী; সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

৬। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৩৪৭নং)*

৭। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।" *(আবূ দাঊদ ৪০৯৭, ইবনে মাজাহ ১৯০৪নং)*

তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মত লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মত লেবাস পরে। *(আবূ দাঊদ ৪০৯৮, ইবনে মাজাহ ১৯০৩নং)*

৮। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের (খুব ভালো অথবা খুব খারাপ) লেবাস পরলে সাধারণতঃ পরিধানকারীর মনে গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৪৬নং)*

"যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।" *(আবূ দাঊদ, বাইহাকী; সহীহুল জামে' ৬৫২৬নং)*

প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর কাছে মহিলার কোন প্রকার পর্দা নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক অপরের জন্য লেবাস। বাড়ির এগানা পুরুষ (বাপ-ভাইদের) কাছে হাত, পা, মাথা ও ঘাড় ঢাকা জরুরী নয়। মহিলাদের সামনে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জরুরী। তবে

মহিলা যদি কাফের হয় অথবা এমন মহিলা বলে আশঙ্কা হয়, যে তার রূপ-লাবণ্য নিজ স্বামী বা অন্য কোন পুরুষের কাছে বয়ান করবে, তাহলে তার সামনেও কেশ ও বক্ষের সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয নয়।

আর পুরুষদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১। লেবাস যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ অবশ্যই আবৃত রাখে। যেহেতু ঐটুকু অঙ্গ পুরুষের লজ্জাস্থান। *(সহীহুল জামে' ৫৫৮৩ নং)*

২। এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

৩। এমন আঁট-সাট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়।

৪। কাফেরদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।

৫। মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

৬। জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়।

৭। গাঢ় হলুদ বা জাফরানী রঙের যেন না হয়। আম্র বিন আস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আমার গায়ে দু'টি জাফরানী রঙের কাপড় দেখে বললেন, "এগুলো কাফেরদের কাপড়। সুতরাং তুমি তা পরো না।" *(মুসলিম, মিশকাত ৪৩২৭নং)*

৮। লেবাস যেন রেশমী কাপড়ের না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১নং)* "দুনিয়ায় রেশম-বস্ত্র তারাই পরবে, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩২০ নং)*

হযরত উমার ﷺ বলেন, রসূল ﷺ রেশমের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ (অন্য কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে) ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। *(মুসলিম, মিশকাত ৪৩২৪নং)* তদনুরূপ কোন চর্মরোগ প্রভৃতিতে উপকারী হলে তা ব্যবহারে অনুমতি আছে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩২৬নং)*

৯। পরিহিত লেবাস (পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি, কামীস প্রভৃতি) যেন পায়ের গাঁটের নিচে না যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "গাঁটের নিচের অংশ লুঙ্গির (অঙ্গ) জাহান্নামে।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩১৪নং)* "মু'মিনের লুঙ্গি পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত। এই (অর্ধেক রলা) থেকে গাঁট পর্যন্ত অংশের যে কোনও জায়গায় হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর নিচের অংশ দোযখে যাবে।" এরূপ ৩ বার বলে তিনি পুনরায় বললেন, "আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩১)*

প্রকাশ থাকে যে, পুরুষদের জন্য কাপড় গাঁটের উপর থেকে নিয়ে পায়ের রলার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত উঠিয়ে পড়া সুন্নত। অবশ্য যেখানে প্রসিদ্ধি, রিয়া ও বিদ্রূপের ভয়

আছে সেখানে বেশী তুলে লুঙ্গি বা পায়জামা পরা উচিত নয়।

যেমন পায়ের রলায় গোদ বা শীর্ণতা অথবা গাঁটের আশেপাশে কোন ত্রুটি ঢাকার জন্যও গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা বৈধ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৪০৫)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় লেবাস ছিল কামীস (ফুল-হাতা প্রায় গাঁটের উপর পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৩২৮নং)* যেমন তিনি চেক-কাটা চাদর পরতে ভালোবাসতেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩০৪নং)*

তিনি মাথায় ব্যবহার করতেন পাগড়ী। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৪৬৭৬নং)* তিনি কালো রঙের পাগড়ীও বাঁধতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৭৭, ইবনে মাজাহ ৩৫৮৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবা তথা সলফদের যুগে টুপীও প্রচলিত ছিল। *(বুখারী, ফাতহুল বারী ১/৫৮৭, ৩/৮৬, মুসলিম ৯২৫, আবূ দাউদ ৬৯১নং)*

যেমন সে যুগে শেলোয়ার বা পায়জামাও পরিচিত ছিল। মহানবী ﷺ ও পায়জামা খরিদ করেছিলেন। *(ইবনে মাজাহ ২২২০, ২২২১নং)* তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হাজীদেরকে পায়জামা পরতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬৭৮নং)* অবশ্য লুঙ্গি না পাওয়া গেলে পায়জামা পরতে অনুমতি দিয়েছেন। *(ঐ ২৬৭৯নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ যখন লুঙ্গি পরতেন, তখন লুঙ্গির সামনের দিকের নিচের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে দিতেন এবং পেছন দিকটা (গাঁটের) উপরে তুলে নিতেন। এরূপ পরার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে এরূপ পরতে দেখেছি।' *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৩৭০নং)*

তাঁর নিকট পোশাকের সবচেয়ে পছন্দনীয় রঙ ছিল সাদা। তিনি বলেন, "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ সাদা রঙের কাপড় বেশী পবিত্র থাকে। আর ঐ রঙের কাপড়েই তোমাদের মাইয়্যেতকে কাফনাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩৭নং)*

এ ছাড়া সবুজ রঙের কাপড়ও তিনি ব্যবহার করতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৬৫নং)* এবং লাল রঙেরও লেবাস পরিধান করতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৭২, ইবনে মাজাহ ৩৫৯৯, ৩৬০০নং)*

মুহাদ্দেস আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'লাল রঙের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়।' *(মিশকাতের টীকা ২/১২৪৭)*

রঙের মধ্যে হলুদ বা জাফরানী রঙ ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

লেবাসে-পোশাকে সাদা-সিধে থাকা ঈমানের পরিচায়ক। *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৩৪৫নং)* মহানবী ﷺ বলেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিনয় সহকারে সৌন্দর্যময় কাপড় পরা ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতে সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দেবেন; ঈমানের লেবাসের মধ্যে তার যেটা ইচ্ছা সেটাই পরতে

পারবে। *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬১৪৫নং)*

তবে সুন্দর লেবাস পরা যে নিষিদ্ধ তা নয়। কারণ, "আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। বান্দাকে তিনি যে নেয়ামত দান করেছেন তার চিহ্ন (তার দেহে) দেখতে পছন্দ করেন। আর তিনি দারিদ্র ও (লোকচক্ষে) দরিদ্র সাজাকে ঘৃণা করেন।" *(বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৭৪২ নং)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে না।" বলা হল, 'লোকে তো চায় যে, তার পোশাকটা সুন্দর হোক, তার জুতোটা সুন্দর হোক। (তাহলে সেটাও কি ঐ পর্যায়ে পড়বে?)' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার তো 'হক' (ন্যায় ও সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৭৬৭৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ১৯৯৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫১নং)*

আবুল আহওয়াস বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলাম। আমার পরনে ছিল নেহাতই নিম্নমানের কাপড়। তিনি তা দেখে আমাকে বললেন, "তোমার কি মাল-ধন আছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' বললেন, "কোন্ শ্রেণীর মাল আছে?" আমি বললাম, 'সকল শ্রেণীরই মাল আমার নিকট মজুদ। আল্লাহ আমাকে উঁট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া ও ক্রীতদাস দান করেছেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ যখন তোমাকে এত মাল দান করেছেন, তখন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমার বেশ-ভূষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত।" *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫২নং)*

পক্ষান্তরে খুব ভালো পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে তা কেউ ত্যাগ করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সৃষ্টির সামনে ডেকে ঈমানের জোড়া পোশাক তার পছন্দমত পরতে দেবেন। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬১৪৫নং)*

ইসলাম বিলাসিতা ও অপচয় পছন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾ (الأعراف ٣١)

অর্থাৎ, হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং)*

এই জন্য পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার বৈধ নয়; ছোট বাচ্চাদের জন্যও নয়। গলায় চেন পরাতে এমনিই মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। আর সোনার হলে তা ডবল হারাম। হালাল নয়, সোনার বোতাম, আংটি, কলম ইত্যাদি ব্যবহার করা। মহানবী ﷺ বলেন, "সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, ব্যতিক্রমভাবে পুরুষের জন্য সোনার নাক বাঁধার অনুমতি রয়েছে ইসলামে। সাহাবী আরফাজার নাক কাটা গেলে তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দিয়েছিলেন। *(আহমাদ ১৮৫২৭, আবূ দাউদ ৪২৩২, তিরমিযী ১৭৭০, নাসাঈ ৫১৬১নং)*

প্রয়োজনে সোনার তার দিয়ে দাঁত বাঁধতে অথবা সোনার দাঁত বাঁধিয়ে ব্যবহার করাতেও অনুমতি আছে শরীয়তে।

১। যে কাপড়ে কোন বিচরণশীল প্রাণীর ছবি অথবা অমুসলিমদের প্রতীক চিত্রিত থাকে সে কাপড় পরা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। এমন কাপড় পরে নামায শুদ্ধ হয়ে গেলেও সে গোনাহগার হবে। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ্ দায়িমাহ ৬/ ১৭৯, ১৮৩)*

২। কাপড় পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন। অর্থাৎ, ডান হাত ও পায়ে আগে কাপড় প্রবেশ করান।

৩। কাপড় পরার ও খোলার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করুন। *(দুআ ও যিক্‌র দ্রষ্টব্য)*

৪। সতর্কতার বিষয় যে, অনেকে মডার্ন, আধুনিক বা মডেল পার্সন হতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে নিজের জন্য অথবা মা, বোন, স্ত্রী বা ছেলে-মেয়েদের জন্য যে সব লেবাস-পোশাক ক্রয় করে, তার উপরে কি সব শব্দ বা বাক্য লিখা থাকে তা খেয়াল করে না। এক ব্যক্তি তার ছোট শিশু-পুত্রের সাথে বাজারে গিয়েছিল। হঠাৎ করে একজন জিজ্ঞাসা করে বসল, কি ব্যাপার ছেলেটির? (ছেলেটিকে বিক্রি করতে চান কেন?) কারণ, ছেলেটির শার্টের সম্মুখভাগে বড় অক্ষরে লিখা আছে, Baby for Sale। অর্থাৎ ছেলেটি বিক্রয়ের জন্য!!

অনুরূপই মহিলাদের বুকের উপর লিখা থাকে এমন সব কথা, যা অনেকে শুনতেও লজ্জাবোধ করবে। আবার এমন কথা লিখা থাকে যা একজন মুসলিমের ঈমান-বিরোধী অথবা শালীনতা ও রুচি-বিরোধী। তার কিছু নমুনা নিম্নরূপ ঃ-

Christmas; বড় দিন, খৃষ্টের জন্মদিন
Bible; বাইবেল
Vicar; খৃষ্টান পল্লী-যাজক
Adulterer; ব্যভিচারী, লম্পট
Prustitue; ব্যভিচারী, লম্পট
Bastard; জারজ, জঘন্য
Xaint (ST); শিকার
Athirst; পিপাসিত, উদগ্রীব
Clergyman; ধর্মযাজক
Look me; আমাকে দেখ
Buy me; আমাকে ক্রয় কর
Take me; আমাকে গ্রহণ কর
Follow me; আমার পিছা ধর
Touch me; আমাকে স্পর্শ কর
Kiss me; আমাকে চুমা দাও
Hussy; বেহায়া, নির্লজ্জ
Vice; বেহায়া, নির্লজ্জ
Nike; বিজয়ের দেবী
Dram; এক প্রকার মদ
Brew; এক প্রকার মদ
Spirit; এক প্রকার মদ
Brandy; এক প্রকার মদ
Madonna; কুমারী মেরী
Atheist; নাস্তিক
Nun; সন্নাসিনী
Pork; শুয়োরের মাংস
Lard; শুয়োরের চর্বি
Secular; ধর্মহীন
Trinity; ত্রিত্ববাদ
Pederasty; সমকাম
Naked; বিবস্ত্রা, নেংটা, উলঙ্গ, অশ্লীল
Cross; ক্রুশ
Magus; অগ্নিপূজক
Buddhist; বৌদ্ধ
Eccemricity; অদ্ভুত, খামখেয়ালী
Flirt; ছিনালি, ঢেমনামি
Viren; অসতী, কুলটা
Nude; বিবস্ত্রা, নেংটা, উলঙ্গ
Whore; ব্যভিচারিণী, বেশ্যা
Adultery; ব্যভিচার
Chars girl; নর্তকী
Socialism; সমাজতন্ত্র
I'm ready for sexual-offers; যৌন-সম্পর্ক কায়েম করার জন্য আমি প্রস্তুত
Miss V; মিসেস বেশ্যা
Charch, Kirk; গির্জা
Charming; যাদুকর
Cupid; প্রেমের দেবতা
Brahman; ব্রাহ্মণ
Tippler; শারাবী, মাতাল

Zion; ইহুদী আন্দোলন
Christimity; খৃষ্টবাদ
Lusts; কাম-লালসা
Son of bitch; ছিনালের বেটা
Hell; দোযখ
Lucifer; ইবলীস
Bawdy; চরিত্রহীন
Monk; সন্নাসী
Pig, Swine; শুয়োর
Ham; শুয়োরের রান
Sow; মাদী শুয়োর
Synagogue; ইহুদী গির্জা
Veda; বেদ
Polytheist; মুশরিক
Easter; খৃষ্ট-পর্ব
Gospel; ইঞ্জীল
Jewish; ইহুদী
Mystic; সূফীপন্থী

'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ,
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান,
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?'

দেহাঙ্গের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা

মুসলিম মানে একজন সুসভ্য মানুষ। লেবাসে-পোশাকে, দেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যে সে হবে সুদর্শন। তার নিকট থেকে সুগন্ধ পাওয়া যাবে। তা না পাওয়া গেলেও অন্ততঃপক্ষে কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে না তার নিকট থেকে।

কিন্তু মুসলিমের আকৃতি ও প্রকৃতি হবে কার মত? তার আকারে-প্রকারে নমুনা কে? নিঃসন্দেহে এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় সভ্য মানুষ তিনিই, যিনি তাঁর সর্ব-আচরণে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সবার চেয়ে প্রিয় ছিলেন। আর তিনিই হবেন প্রত্যেক মুসলিমের সকল বিষয়ের নমুনা ও আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, (তোমাদের মধ্যে) যে আল্লাহ ও পরকালে আশা (বিশ্বাস বা ভয়) রাখে এবং অধিকাধিক আল্লাহকে স্মরণ করে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না -যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

বুঝতেই তো পারছেন, আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা হতে হলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁরই ইচ্ছামত হতে হবে। মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ শরীর হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেওয়া বিধান ও নির্দেশ অনুযায়ী। আপনার আকার-আকৃতিতে অনুকরণ করতে হবে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর।

পুরুষের সাজ-সজ্জা

মানুষের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর দেওয়া এক একটি নেয়ামত। অঙ্গ-বিকৃতি বৈধ নয়, কারণ তাতে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন হয়। আর আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোতে আল্লাহর অনুমতি নেই। অবশ্য মানুষ হিসাবে তা ৫ প্রকার হতে পারে। বৈধ, মুস্তাহাব, ওয়াজেব, হারাম ও মকরূহ। যেমন দেহের (বুকের বা জাঙ্গের) লোম তুলে ফেলা বৈধ। বোগল ইত্যাদির লোম (৪০ দিনের আগে আগে) পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। নাভির নিচের লোম (৪০ দিন পার হলে) সাফ করে ফেলা ওয়াজেব। দাড়ি চেঁছে ফেলা হারাম এবং মোচ চেঁছে ফেলা মকরূহ।

কিছু কেটে ফেলা নির্দিষ্ট সময়ে হারাম; যেমন ইহরামে বা যিলহজ্জের প্রথম ৯ দিনে নখ-চুল-চামড়া কাটা হারাম। আবার নাক ইত্যাদি অঙ্গ ক্ষয় হয়ে গেলে প্লাস্টিক সার্জারি করে সৌন্দর্য আনা বৈধ।

❁ মাথা ও চুল

মুসলিমের মাথা কখনো থাকে লম্বা চুলে ঢাকা; আবার কখনো থাকে নেড়া। বিশেষ করে উমরা বা হজ্জ করার পর মাথা নেড়া করতে হয়। অতঃপর সেই চুল ধীরে ধীরে বড় হয়, মাঝারি হয় এবং লম্বা হয়। সেই হিসাবে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মাথার চুলও প্রকৃতিগতভাবে সব ধরনের ছিল।

কখনো ছিল কানের অর্ধেক বরাবর লম্বা। *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ২১নং)*

কখনো ছিল তার থেকে বেশী লম্বা; কানের লতি বরাবর। আর আরবীতে একে 'অফরাহ' বলা হয়।

কখনো ছিল তার থেকেও বেশী লম্বা; কানের নিচ বরাবর; কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর। একে আরবীতে 'লিম্মাহ' বলা হয়। *(আবূ দাউদ ৪১৮৬, ইবনে মাজাহ ৩৬৩৪, ঐ ২২নং)*

আবার কখনো ছিল তার থেকেও বেশী লম্বা কাঁধ বরাবর। আরবীতে যাকে 'জুম্মাহ' বলা হয়। *(ঐ ৩নং)*

কখনো তিনি তাঁর ঐ লম্বা চুলে চারটি বেণি গেঁথে নিতেন। *(ঐ ২৩নং)*

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, এমন (লম্বা) চুল রাখা সুন্নত। আমাদের সামর্থ্য হলে আমরাও রাখতাম। কিন্তু তা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/৩২৮)*

বলা বাহুল্য, সুন্নতী [২] সবচেয়ে বড় চুল হল কাঁধ বরাবর। এর চেয়ে বড় চুল মহানবী ﷺ-এর তরীকার খিলাপ।

তিনি মাথায় তেল ব্যবহার করতেন। *(মুসলিম ২৩৪৪নং)*

তিনি মাথার চুলকে আঁচড়ে সুবিন্যস্ত করে রাখতেন।

তিনি বলতেন, "যার চুল আছে, সে যেন তার যত্ন করে।" *(আবূ দাউদ ৪১৬৩নং)*

একদা তিনি ﷺ এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই যে, তার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" *(আবূ দাউদ ৪০৬২, নাসাঈ ৫২৩৬, আহমাদ ১৪৪৩৬, মিশকাত ৪৩৫১ নং)*

তবে চুলের যত্নে বাড়াবাড়ি করা যাবে না; যেমন মহিলারা করে থাকে। যেহেতু মহানবী ﷺ প্রত্যেক দিন চুল আঁচড়াতেন না। বরং মাঝে মাঝে একদিন করে বাদ দিয়ে আঁচড়াতেন। তিনি প্রত্যহ চুল আঁচড়াতে নিষেধও করেছেন। *(নাসাঈ ৫০৫৪, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ২৮-নং)*

তিনি নিষেধ করেছেন (বেশী বেশী তেল-শ্যাম্পু দিয়ে) চুলের বিলাসিতা করতে। *(আবূ দাউদ ৪১৬০নং, নাসাঈ)*

তিনি চুল আঁচড়াবার সময় ডান দিক থেকে শুরু করতেন। *(ঐ ২৭নং)*

তিনি তাঁর মাথার মাঝখানে সিঁথি করতেন। *(আবূ দাউদ ৪১৮৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৩৩নং)*

অতএব চুল লম্বা হলে মাঝে সিঁথি করা সুন্নত এবং সিঁথি না করে ছেড়ে রাখা মকরূহ। যেহেতু তাতে আহলে কিতাবের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। অবশ্য চুল ছোট হলে সিঁথি না করে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে রাখায় দোষ নেই। *(শা'রুর রা'স ৫০পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, বাম বা ডান দিকে টেরি করা সুন্নতী তরীকা নয়। বরং তা বিজাতির অনুকরণে করলে অবৈধ।

তদনুরূপ বিজাতি বা হিরোদের অনুকরণ করে চুল কাটিং ও থাক থাক করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)*

সতর্কতার বিষয় যে, আল্লাহর নবী ﷺ-এর চুল লম্বা হলেও মস্তানদের চুল কিন্তু ঐ শ্রেণীর নয়। মস্তানদের চুল আসলে হিরোদের অনুকরণে রাখা হয়।

আধুনিক যুগে প্রসিদ্ধ অথবা কাফের ব্যক্তিত্ব, হিরো অথবা পশুর অনুকরণে সেই নামে চুলের নানা ডিজাইন ও কাটিং প্রচলিত হয়েছে যুবক-যুবতীদের মাঝে। যেমন ঃ

---

(২) *প্রকাশ থাকে যে, অনেকে আল্লাহর নবী ﷺ-এর মাথার চুল রাখার ব্যাপারটাকে তাঁর প্রকৃতিগত অভ্যাস মনে করেছেন।*

স্পাইক, কেয়ারলী, সীজার, মাইকেল, লায়ন, ফ্র্যান্সী, ইংরেজী, বাংলা, রাহুল, কাপূরী, বাবরী, সাধনা, ডিয়ানা, র‍্যাট, আলবার্ট, আর্মী, বব, হিপ্পী, রাউন্ড, রানিং, স্টেপ, স্লোপ প্রভৃতি। ঐ শ্রেনীর মানুষ বা পশুর অনুকরণে এ সকল ডিজাইন ও কাটিং ব্যবহার কোন মুসলিম করতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, আয়না দেখার সময় পঠনীয় কোন দুআ নেই। যেহেতু সে ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুনঃ ইরওয়াউল গালীল ১/ ১১৫)*

❁ মাথানেড়া

মাথা নেড়া করার বিভিন্ন অবস্থা ও মান রয়েছে। সুতরাং হজ্জ ও উমরাহতে চুল ছোট না করলে নেড়া করা ওয়াজেব। হজ্জ বা উমরাহ ছাড়া অন্য সময় করতে হয় বা করলে সওয়াব হয় মনে করে মাথা নেড়া করা হারাম বা বিদআত। অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে ঘন চুল নেড়া করা মুস্তাহাব। যেমন শিশুর বয়স সাত দিন হলে তার চুল নেড়া করে ফেলা মুস্তাহাব। আর মাথায় উকুন দূর করার জন্য অথবা ঘা চিকিৎসার জন্য অথবা মাথা হাল্কা করার জন্য চুল নেড়া করা বৈধ।

মাথা নেড়া করার সময় মাথার কিছু অংশ নেড়া করা এবং কিছু অংশের চুল অবশিষ্ট রাখা বৈধ নয়। বরং নেড়া করলে সম্পূর্ণভাবে নেড়া করতে হয়। *(বুখারী ৫৯২১, মুসলিম ২১২০নং প্রমুখ)* সুতরাং শিশুর মাথা নেড়া করার সময় ফিতে বাঁধার জন্যেও তার মাথার সামনে কিছু চুল ছেড়ে (লোটন) রাখা বৈধ নয়।

বৈধ নয় মাঝে-ফাঁকে মাথার বিভিন্ন জায়গা মুন্ডন করা এবং বাকী জায়গায় চুল রাখা।

বৈধ নয় মাথার সামনের অংশ নেড়া করা এবং পিছনের অংশে চুল রাখা।

বৈধ নয় মাথার পিছনের অংশ নেড়া করা এবং সামনের অংশে চুল রাখা।

বৈধ নয় মাথার চারিপাশ নেড়া করা এবং মাঝের অংশে চুল রাখা।

বৈধ নয় মাথার মাঝের অংশ নেড়া করা এবং চারিপাশের অংশে চুল রাখা।

যেহেতু এ সবে রয়েছে বিজাতির অন্ধানুকরণ।

অবশ্য চুল কামানোর সময় মাথার ধারের চুল (ভিত) কামানো এর পর্যায়ভুক্ত নয়।

চুল কাটা বা নেড়া করার সময় যার চুল কাটা বা নেড়া করা হবে তার ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। নাপিতের ডান দিক থেকে নয়। *(মুসলিম ১৩০৫, আবূ দাঊদ ১৯৮১, তিরমিযী ৬১২নং)*

❁ চুলপাকা

বয়স হলে চুল পাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। কথিত আছে যে, এ জগতে সর্বপ্রথম চুল সাদা হয় হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর।

আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের চুল পাকে এবং তাতে মানুষের কাছে তার সম্মান বাড়ে। লোকেরা তাকে দেখে বড় ও মুরব্বী বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। আর ইসলামেও চুল পাকার বড় মাহাত্ম্য রয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতির কারণে) একটি চুল পাকে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, "শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।" *(ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩ নং)*

আর সে জন্যই চুল পেকে গেলে তা তুলে বা ছিঁড়ে ফেলা বৈধ নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিনে নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ ঝরিয়ে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২০৯৬নং)*

❁ কলপ

চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেলে, তা সাদাই ছেড়ে রাখা ঠিক নয়। বরং তা রঙিয়ে ফেলতে হয়। খোদ আল্লাহর রসূল ﷺ কলপ ব্যবহার করেছেন এবং উম্মতকে তা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধও করেছেন। অতএব তা করা সুন্নত।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, সহীহুল জামে' ১৯৯৮নং)*

কিন্তু কলপের রঙ কালো হওয়া চলবে না। কালো ছাড়া যে কোন রঙ দিয়ে কলপ করা যায়। অবশ্য কালচে লাল বা বাদামী রঙ সবচেয়ে উত্তম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে পাকা চুল-দাড়ি রঙিয়ে থাকো, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হল, মেহেদি ও কাতাম। *(আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১৫৪৬নং)*

'কাতাম' এক শ্রেণীর গাছড়ার নাম, যার পাতা থেকে লালচে কালো রঙ প্রস্তুত করা হয়।

আর কালো রঙ ব্যবহার করা চলবে না, যেহেতু জাবের ؓ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হল। তখন তাঁর চুল-দাড়ি ছিল 'যাগামা' ফুলের মত সফেদ (সাদা)। নবী ﷺ বললেন, "কোন রঙ দিয়ে এই সফেদিকে বদলে ফেল। আর

কালো রঙ থেকে ওঁকে দূরে রাখ।” *(মুসলিম, মিশকাত ৪৪২৪নং)*

আর সকলের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “শেষ যামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মত কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(আবূ দাউদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮১৫৩নং)*

প্রকাশ থাকে যে, কালো চুলকে অন্য রঙ দিয়ে রঙানো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোর আওতাভুক্ত হতে পারে। সুতরাং তা বর্জনীয়।

❁ মাথার লেবাস

পুরুষের মাথার পোশাক হল পাগড়ী ও টুপী। পরিপূর্ণ পরিচ্ছদ গ্রহণ করার সময় মাথায় পাগড়ী রাখা সুন্নত। যেমন টুপী রেখেও মাথার সৌন্দর্য গ্রহণ করা কর্তব্য। ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য আমাদের উচিত হল, অমুসলিম সমাজেও সে লেবাস পরে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা।

বিশেষ করে নামাযে পাগড়ী অথবা টুপী পরিধান করে সৌন্দর্যের সাথে মহান আল্লাহর দরবারে দন্ডায়মান হওয়া। অবশ্য পাগড়ী অথবা টুপী না থাকলে মাথায় গা মোছা গামছা, 'রু' (চেহারা) মোছা রুমাল অথবা তালপাতা কিংবা প্লাস্টিকের তৈরী টুপী মাথায় দিলে সৌন্দর্য আসে না। বরং তা অনেক সময় খারাপ লাগে। আর সে সময় তা ব্যবহার না করে খালি মাথায় নামায পরা বৈধ হবে। তবে জেনে রাখা ভালো যে, খালি মাথায় নামায পড়া ভালো নয়। বরং ইচ্ছাকৃত মাথায় সৌন্দর্য গ্রহণ না করে নামায পড়া মকরূহ। যেহেতু তা মহানবী ﷺ ও সলফের আমলের খিলাপ।

পক্ষান্তরে টুপীর আকার কেমন হবে, তা নির্দিষ্ট করা মুশকিল। গোল টুপী না লম্বা টুপী?

যে টুপী মুসলিম পরিবেশে প্রচলিত, যে টুপীতে মাথার যথার্থ সৌন্দর্য আনে এবং যে টুপী কোন অমুসলিমদের টুপীর মত নয় তাই পড়ে নামায হবে। যেমন যে রুমাল কেবল মাথার সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত, তা মাথায় দিয়েও নামায হবে।

❁ কান

পুরুষের জন্য কান ফুঁড়ানো বৈধ নয়। বৈধ নয় কানের অলঙ্কার ব্যবহার। যেহেতু তাতে মহিলাদের অনুকরণ হয়।

❁ কপাল

ছেলের কপালে টিপ বা ফোঁটা ব্যবহার বৈধ নয়। বৈধ নয় নযর লাগার ভয়ে পাশকপালে ফোঁটা দেওয়া। বরং এটা হল শির্ক।

❁ ভ্রূ

ভ্রূ চাঁছা বৈধ নয়। ভ্রূ চাঁছা নারী-পুরুষ অভিশপ্ত।

❁ চোখ

মুসলিম নিজ চক্ষু দ্বারা কেবল ভালো জিনিস দেখবে। যে দেখাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অথবা অনুমতি আছে কেবল তাই দর্শন করবে।

মুসলিমের চোখের চাহনি হবে অবনত। চোরা চাহনি বা বাঁকা দৃষ্টিতে কোন অবৈধ জিনিস মুসলিম দেখতে পারে না। কারণ এটি এক প্রকার খেয়ানত। আর এ খেয়ানতের খবর আল্লাহ রাখেন। চোখের বাঁকা ছুরি চালিয়ে কাউকে যবাই করতে পারে না। পারে না নজর-বাণ মেরে কাউকে ঘায়েল করতে। কেননা চোখও ব্যভিচার করে। আর চোখের ব্যভিচার হল কাম নজরে অবৈধ নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা। এই জন্য চোখ ঠারা, চোখ মারা বা চোখ দ্বারা কোন অবৈধ প্রণয়ের ইশারা করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

অন্ধ হলে ধৈর্য ধরুন। তার বিনিময়ে রয়েছে বেহেশ্ত। মানুষের চোখের ব্যস্ততা বেশী। সুতরাং আপনার অবসর সময়কে কুরআন তেলাঅত ও আল্লাহর যিক্‌রের জন্য কাজে লাগান।

চোখের রোগের জন্য চশমা ব্যবহার তো বৈধই। অবশ্য মস্তানির জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। উচিত নয় রঙিন চশমার আড়ালে অবৈধ কিছু দেখা।

সুর্মা ব্যবহার

সুর্মা হল সুরমাদের প্রসাধন এবং নারী-পুরুষ সকলের জন্য কিছু চক্ষু-পীড়ার ওষুধ। বিশেষ করে 'ইষমিদ' নামক সুর্মা ব্যবহার করলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পাতার লোম গজায়। *(আহমাদ ২০৪৮, আবূ দাঊদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ১৭৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৪৯৭নং)*

বলা বাহুল্য, পুরুষের চোখে ব্যবহৃত কোন প্রসাধন নেই। সুর্মা কিন্তু কোন প্রসাধন নয়। বরং তা ওষুধ বলে ব্যবহার করা সুন্নত।

সুর্মা দিনে লাগানো যায়। আল্লাহর নবী ﷺ রোযা রেখে সুর্মা ব্যবহার করেছেন। *(ইবনে মাজাহ ১৬৭৮-নং)* অবশ্য সুর্মা রাত্রে শোবার আগে লাগানোই উত্তম। *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৪৩নং)* যেহেতু চোখ বন্ধ রাখলে তার প্রতিক্রিয়া হয় অধিক।

যেমন বেজোড় সংখ্যক (অর্থাৎ ৩ অথবা ৫ বার) সুর্মা লাগানো সুন্নত। *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৪৬৮০নং)*

তিনি বলেন, "যখন তোমাদের কেউ সুর্মা লাগায় তখন সে যেন বেজোড় সংখ্যক লাগায়--।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩৭৫নং)*

বেজোড় সংখ্যক লাগাতে হলে ডান চোখে ৩ বার এবং বাম চোখে ৩ বার লাগাতে

হবে অথবা ডান চোখে ২ বার এবং বাম চোখে ১ বার লাগাতে হবে অথবা ডান চোখে ১ বার এবং বাম চোখে ২ বার লাগাতে হবে। অবশ্য প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশী ৫ বা ৭ বার অনুরূপ ব্যবহার করা যায়।

সতর্কতার বিষয় যে, পুরুষরা মহিলাদের মত চোখের সৌন্দর্যের জন্য সুর্মা ব্যবহার করতে পারে না। বরং শরীয়তে সুর্মা ব্যবহার করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল চোখের উপকারের জন্য; সৌন্দর্যের জন্য নয়। অতএব পুরুষ সুর্মা লাগাবে কেবল চোখের ভিতরে; চোখের পাতায় বা কোণে (রেখা টেনে) নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কোন পুরুষের পক্ষেও সৌন্দর্যের জন্য মাথায় নকল চুল লাগানো, হাত বা চেহারায় দেগে নকশা করা, ভ্রূ চাঁছা, দাঁতের মাঝগুলি ঘসে ফাঁক ফাঁক করা ইত্যাদি বৈধ নয়। এমন কাজের মহিলারা আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত হলেও পুরুষরা সে অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

❁ গাল, গালের লেবাস দাড়ি

দাড়ি রাখা পুরুষের জন্য একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রকৃতিগত সুন্নত হল ১০টি; মোচ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি নেওয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, আঙ্গুল ধোয়া, বোগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নীচের লোম চেঁছে সাফ করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা এবং কুল্লি করা।” *(মুসলিম ২৬১নং)*

দাড়ি চাঁছা, ছিঁড়া বা ছোট করে ছাঁটা হারাম ও কাবীরা গোনাহ। যেহেতু ঃ-

(ক) দাড়ি বর্ধনের উপর রসূলের আদেশ উল্লঙ্ঘন এবং তাতে তাঁর বিরোধিতা করা হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ১০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, “মোচ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।” *(মুসলিম ২৬০ নং)*

(খ) দাড়ি না রাখলে কাফেরদের প্রতিরূপ ধারণ করা হয়। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য ধারণ করে, সে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত।” *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে’ ৬০২৫ নং)*

(গ) দাড়ি চেঁছে ফেললে নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। অথচ মহানবী ﷺ নারীদের আকৃতি ধারণকারী পুরুষদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং

পুরুষদের বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫নং, আসহাবে সুনান)*

(ঘ) দাড়ি কাটলে (আল্লাহর বিনা অনুমতিতে) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞার আনুগত্য হয়।

আল্লাহ তাআলা (শয়তানের প্রতিজ্ঞা উল্লেখ করে) বলেন,

(وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)

অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।" *(সূরা নিসা ১১৯ আয়াত)*

আর যেহেতু তাতে সেই প্রকৃতি বিনাশ করা হয়, যে প্রকৃতির উপর আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন। কারণ দাড়িকে (নিজের অবস্থায়) বর্জন করা প্রকৃতিগত নিয়মের পর্যায়ভুক্ত।

(ঙ) দাড়ি রাখা সকল আম্বিয়া ও আওলিয়ার সুন্নত (তরীকা)। আর তাঁদের তরীকা থেকে বিচ্যুত হওয়া কোন মুসলিমের উচিত নয়।

(চ) দাড়ি মুসলিমদের এক প্রতীক। এই প্রতীক নিশ্চিহ্ন করা কোন মুসলিমের উচিত নয়।

(ছ) দাড়ি হল পৌরুষ ও সম্মানের নিদর্শন, পুরুষের সৌন্দর্য ও সমীহপূর্ণ ভূষণ। বৃদ্ধ বয়সে টোল পড়া গালের আবরণ।

❁ দাড়ি ছাঁটা

দাড়ির সীমা ; দুই গন্ড ও তার পার্শ্বদ্বয় এবং চিবুকের লোমকে দাড়ি বলা হয়; যেমন আভিধানিকদের কথা এটাই প্রমাণ করে। আর নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি বৃদ্ধি কর।" কিন্তু দাড়িকে কোন শরয়ী সীমায় সীমাবদ্ধ করেননি। আর যখন দলীল বা উক্তি আসে অথচ তার কোন শরয়ী সীমা থাকে না তখন তাকে আভিধানিক সীমায় আরোপ করা হয়। তাছাড়া তিনি নিজে দাড়ি ছেঁটেছেন বা কাউকে ছাঁটতে আদেশ করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস নেই। আর এই জন্যই দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই উত্তম।

অবশ্য যে সাহাবীগণ মহানবী ﷺ-এর উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা কোন কোন সময় এক মুঠোর অতিরিক্ত দাড়ি ছেঁটে সৌন্দর্য অবলম্বন করেছেন বলে একাধিকভাবে প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর ঐ আদেশকে সাহাবায়ে কেরামের বুঝ নিয়ে বুঝলে আমরা বুঝতে পারব যে, এক মুঠোর কম পরিমাণ ছোট করে কাটা বা ছাঁটা বৈধ নয় এবং এর অতিরিক্ত ছেঁটে ফেলা গোনাহর কাজ নয়। *(দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৫/৩৭৫-৩৮০)*

❁ নাক

নাকের পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা মুসলিমের একটি কর্তব্য। বিশেষ করে ঘুম থেকে উঠে তিনবার নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা কর্তব্য। কারণ শয়তান মানুষের নাকের গভীর রন্ধ্রে রাত্রিবাস করে থাকে। *(বুখারী ৩২৯৫, মুসলিম ২৩৮নং)*

নাকের লোম বড় হলে তা তুলে বা কেটে ফেলা বৈধ। আর এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, নাক কাটা গেলে তার বিনিময়ে স্বর্ণের নাক লাগানো যায়।

❁ মোচ বা গোঁফ

পুরুষের অধরে (নিচের ঠোঁটে) থাকবে দাড়ি এবং ওষ্ঠে (উপরের ঠোঁটে) থাকবে মোচ। আর এই মোচ হবে ছেঁটে ছোট করা। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম মোচ কেটে ছোট করেন হযরত ইবরাহীম ﷷ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেঁটে ফেলো।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার মোচ ছাঁটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(তিরমিযী, ২৭৬২, সহীহুল জামে' ৬৫৩৩নং)*

তিনি সাহাবী মুগীরাহ বিন শো'বাকে (ঠোঁটের নিচে) দাঁতন রেখে মোচ ছাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তিনি নিজে মুগীরার মোচ ঐভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ১৮৮, মিশকাত ৪২৩৬নং)*

তিনি বলেন, "তোমরা মোচ খুব ছোট করে ছেঁটে ফেল।" *(বুখারী)*

বলাই বাহুল্য যে, খুব ছোট করে (চামড়া বের করে) অথবা দাঁতন রেখে (কাঁইচি দিয়ে) মোচ ছেঁটে ফেলা সুন্নত। (ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে) গোঁফ চাঁছা সুন্নত নয়। বরং সুন্নত হল, ছেঁটে ছোট করা। সুন্নত নয় কিছু চেঁছে এবং মাঝে বা উপরে সরু করে গোঁফ ছেড়ে রাখা।

বৈধ নয় মাঝখান কামিয়ে দুই সাইডে লম্বা টাঙ্গি মোচ রাখা। যেহেতু তাতে রয়েছে বিজাতির সাদৃশ্য।

অবশ্য মোচ লম্বা হলে পানি বা অন্য কিছু পান করার সময় মোচের সাথে স্পর্শ হলে তা হারাম হয়ে যায় না। কারণ 'মোচের পানি হারাম' কথাটির দলীল আবশ্যিক।

❁ দাঁত

মানুষের জন্য দাঁতও একটি অমূল্য সম্পদ। সুতরাং দাঁত থাকতে দাঁতের কদর করা উচিত প্রত্যেকের। ইসলামে সেই কদরের রয়েছে বিভিন্ন আদব; যা নিম্নরূপ ঃ-

খাবার পর দাঁতে লেগে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খিলাল করে ছাড়িয়ে ফেলা কর্তব্য।

যেহেতু তা না করলে দাঁতের রোগ হতে পারে এবং তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

এই জন্য খিলালকারীদের প্রশংসা করে মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের খিলালকারীগণ উত্তম (বা প্রশংসনীয়)।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৬৭নং)*

ইবনে উমার বলেন, 'যে খিলাল ত্যাগ করে, তার দাঁত দুর্বল হয়ে যায়।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইরওয়াউল গালীল ১৯৭৪নং)*

দাঁত পরিষ্কার করার আদব

কথিত আছে যে, এ জগতে সর্বপ্রথম দাঁতন করেন হযরত ইবরাহীম ﷺ।

প্রত্যেক ওযূর আগে, ওযূ না করলেও নামাযের আগে, কুরআন তেলাঅতের আগে, ঘুম থেকে জেগে উঠে, বাইরে থেকে স্বগৃহে প্রবেশ করে, মুখ দুর্গন্ধময় অথবা দাঁত হলুদবর্ণ হলে দাঁতন করা সুন্নত।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে এশার নামাযকে দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৭৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৩১৯ নং)*

তাই সাহাবী যায়েদ বিন খালেদ জুহানী ؓ মসজিদে নামায পড়তে হাজির হতেন, আর তাঁর দাঁতনকে কলমের মত তাঁর কানে গুঁজে রাখতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় তিনি দাঁতন করে পুনরায় কানে গুঁজে নিতেন। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ৩৯০ নং)*

মুসলিমের প্রকৃতিগত কর্মসমূহের একটি হল, মিসওয়াক করে মুখ সাফ করা। *(মুসলিম, মিশকাত ৩৭৯নং)*

বিশেষ করে জুমআর দিন গোসল ও দাঁতন করা এবং আতর ব্যবহার করা কর্তব্য। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৪১৭৮ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জিবরীল (আঃ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন, যাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৫৬ নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "---এতে আমার ভয় হয় যে, দাঁতন করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।" *(সহীহুল জামে' ১৩৭৬ নং)*

বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রথম যে কাজ করতেন, তা হল দাঁতন। *(মুসলিম, মিশকাত ৩৭৭নং)* তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই তিনি দাঁতন করে দাঁত মাজতেন। *(বুখারী,*

মুসলিম, মিশকাত ৩৭৮নং) আবার রাত্রের অন্যান্য সময়েও যখন জেগে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করতেন। *(সহীহুল জামে' ৪৮৫৩ নং)* আর এই জন্যই রাত্রে শোবার সময় শিথানে দাঁতন রেখে নিতেন। *(ঐ ৪৮৭২ নং)*

তিনি বলেন, "দাঁতন করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি। *(আহমাদ, দারেমী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী ঃ বিনা সনদে, মিশকাত ৩৮১নং)*

একদা হযরত আলী ﷺ দাঁতন আনতে আদেশ করে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দন্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্তা তার পিছনে দন্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ২১০নং)*

তিনি বলেন, "মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হল কুরআনের পথ।" *(বায্যার, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২১৩ নং)*

১। দাঁতন করা বিধেয় দিবারাত্রির যে কোন সময়। এমনকি রোযার দিনেও সকালে-বিকালে যে কোন সময় দাঁতন করা বিধেয়।

২। একটি দাঁতন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ব্যবহার করতে পারে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ মিসওয়াক করে আমাকে তা ধুতে দিতেন। কিন্তু ধোয়ার আগে আমি মিসওয়াক করে নিতাম। তারপর তা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।' *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৩৮৪নং)*

তাঁর নিকট মিসওয়াকের এত গুরুত্ব ছিল যে, তিরোধানের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি হযরত আয়েশার দাঁতে চিবিয়ে নরম করে নিজে দাঁতন করেছেন। *(বুখারী, মিশকাত ৫৯৫৯ নং)*

৩। দাঁতন করুন ভিজে বা শুকনা গাছের ডাল বা শিকড় দিয়ে। তিনি আরাক (পিল্লু) গাছের (ডাল বা শিকড়ের) দাঁতন করতেন। *(আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল ১/১০৪)*

আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা যায়। তবে এটা সুন্নত কি না বা এতেও ঐ সওয়াব অর্জন হবে কি না, সে ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস মিলে না। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) তালখীসে (১/৭০) এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'এগুলির চেয়ে মুসনাদে আহমাদে আলী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।' কিন্তু সে হাদীসটিরও সনদ যয়ীফ। *(মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকের ১৩৫৫ নং)*

৪। আপনার ডান চোয়ালের দাঁত থেকে দাঁতন ঘষতে শুরু করুন। এটাই হল সুন্নত।

৫। দাঁতন করার সময় কোন দুআ নেই। দাঁতন আধ হাতের বেশী লম্বা হলে তার উপর শয়তান চাপে ধারণা অমূলক।

হেঁটে হেঁটে দাঁতন করলে পরিবারে ও জীবনে অশান্তি নেমে আসে ধারণা করা একটি বিদআত ও অমূলক ধারণা।

❁ জিভ

জিভ পরিষ্কার রাখাও মুসলিমের পরিচ্ছন্নতার একটি কর্তব্য। মহানবী ﷺ দাঁতনের সাহায্যেই নিজের জিভ মেজে পরিষ্কার করতেন এবং সেই সময় তাঁর মুখে বমি করার মত শব্দ হত। *(আহমাদ ৪/৪১৭, মুসলিম ২৫৪, আবূ দাঊদ ৪৯নং, নাসাঈ প্রমুখ)*

❁ গলা

মুসলিমের গলার আওয়াজ হবে মিষ্টি ও বিনত। মুমিন কর্কশভাষী হয় না।

গলার লেবাস হিসাবে গলাবন্ধ (কম্ফর্টার) বা মাফলার ব্যবহার অবৈধ নয়। তবে টাই ব্যবহার বৈধ নয়। যেহেতু তা বিজাতির বিশেষ প্রতীক।

❁ বুক

বুকের লোম তোলা বৈধ। যেমন পিঠ বা জাঙ্গের লোম তুলে ফেলা অবৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১৮২)*

❁ বগল

বগলের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারেও ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব বগলের গন্ধে যাতে অন্য কেউ কষ্ট না পায়, তার খেয়াল রাখা উচিত প্রত্যেক মুসলিমের। যেমন বগলের লোম তুলে বা ছিঁড়ে ফেলা প্রকৃতিগত একটি সুন্নত। এই সুন্নত পালন করেও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা সকলের কর্তব্য।

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নত হল বগলের লোম তুলে বা ছিঁড়ে ফেলা। অবশ্য তা কষ্টকর হলে কেটে, চেঁছে বা কেমিক্যাল ব্যবহার করে পরিষ্কার করে ফেলা বৈধ। *(কাশ্শাফুল ক্বিনা' ১/৯৫)*

❁ হাত

পুরুষের জন্য কোন সময় হাত-পায়ে কোন রঙ ব্যবহার করা বৈধ নয়; বিবাহের সময়ও নয়। কারণ রঙ হল মহিলার জন্য। বলা বাহুল্য, বিবাহের সময় পুরুষের হাতে মেহেন্দী লাগানো মহিলাদেরই সাদৃশ্য অবলম্বন।

সৌন্দর্যের জন্য নয়; বরং টাইম দেখার জন্য হাতে ঘড়ি বাঁধা বৈধ। যে হাতে ঘড়ি নিরাপদে থাকবে এবং ঝাঁকুনি কম লাগবে সেই হাতে বেঁধে রাখা দোষাবহ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর যুগে ঘড়ি ছিল না, সেহেতু তা ডান হাতে বাঁধা সুন্নত -এ কথা বলা যায় না।

সতর্কতার বিষয় যে, যে ঘড়ি আংশিক অথবা পূর্ণরূপে সোনার তৈরী (তা পুরুষের জন্য) এবং যে ঘড়িতে কোন বিজাতির প্রতীক অথবা মূর্তি থাকে সে ঘড়ি ব্যবহার করা বৈধ নয়।

❁ আঙ্গুল

আঙ্গুলের গিরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই সাথে আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় বা আংটি ব্যবহারকে বৈধ করেছে। আল্লাহর নবী ﷺ আংটি ব্যবহার করেছেন। *(বুখারী ৫৮৭৪, মুসলিম ২০৯২নং প্রমুখ)* তাঁর আংটি ছিল রৌপ্যনির্মিত। *(মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াহ ৭৩নং)* তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অবশ্য সে আংটি তিনি শীলমোহর স্বরূপ ব্যবহার করতেন। *(ঐ ৭৪নং)*

তিনি ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন। *(ঐ ৭৭-৮১নং)* ঐ আংটি তিনি অনামিকা (কনিষ্ঠা বা কড়ে আঙ্গুলের পাশের) আঙ্গুলে পরতেন। *(বুখারী ৫৮৭৪, মুসলিম ২০৯২নং)* তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করতেন। *(মুসলিম ২০৭৮, আবূ দাউদ ৪২২৫নং)*

জ্ঞাতব্য যে, বাম হাতেও আংটি পরা বৈধ। মহানবী ﷺ কখনো কখনো বাম হাতে আংটি পরেছেন। *(মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৪৮৯৯নং)* হাসান-হুসাইন ؓ বাম হাতে আংটি ব্যবহার করতেন। *(মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াহ ৮২নং)*

প্রকাশ থাকে যে, বিজাতির অনুকরণে বিবাহের পয়গামের দিন অনুষ্ঠান করে পয়গামের আংটি পরা এবং তা প্রেমের প্রতীক ও ধারক স্বরূপ ব্যবহার করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অনেকে ঐ আংটি আঙ্গুল থেকে খুলে ফেললে অমঙ্গলের আশঙ্কা করে। সুতরাং তা যে শির্ক তা বলাই বাহুল্য।

অনেকে প্রেমিকের পরানো ঐ আংটি বাম হাতে ব্যবহার করে এবং খামাখা ধারণা করে যে, বাম হাতের আঙ্গুলের শিরার সাথে নাকি সরাসরি হৃদয়ের সংযোগ আছে!!

পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা হারাম; যেমন এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ২০৯০নং)*

কথিত মতে, 'চার আনা সোনার আংটি আঙ্গুলে রাখা বৈধ' কথাটি দলীল-সাপেক্ষ। সুতরাং এক আনা বা তার চেয়ে কম সোনারও আংটি ব্যবহার পুরুষের জন্য বৈধ নয়।

বৈধ নয় লোহার আংটি ব্যবহার করাও। যেহেতু মহানবী ﷺ সোনা ও লোহার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪২নং)*

একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তা দেখে তিনি তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তাঁর অপছন্দের কথা বুঝতে পেরে ফিরে গিয়ে সেটি খুলে ফেলে একটি লোহার আংটি পরে এল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, "এটি তো আরো খারাপ। এটি তো জাহান্নামবাসীদের অলংকার!" এ কথা শুনে লোকটি ফিরে গেল এবং সেটিকেও খুলে ফেলে একটি চাঁদির আংটি আঙ্গুলে নিল। তা দেখে নবী ﷺ নীরব থাকলেন। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১০২১নং)*

এখানে জ্ঞাতব্য যে, বিবাহের মোহরের জন্য এক সাহাবীকে তাঁর লোহার আংটি খুঁজতে বলা তা ব্যবহার বৈধ হওয়ার দলীল নয়। *(ফাতহুল বারী ১০/২৬৬, আদাবুয যিফাফ, আলবানী দ্রঃ)*

অষ্টধাতু-নির্মিত আংটি কোন রোগ-বালা দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা শির্ক।

পাথর বসানো আংটি পরা বৈধ। কিন্তু পাথরের কোন অমূলক তাসীরের কথা বিশ্বাস করা শির্ক।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আংটি কিন্তু সৌন্দর্যের জন্য ছিল না। সেটি ছিল তাঁর শীলমোহর। তাই শীলমোহরযুক্ত আংটি ব্যবহার সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল সৌন্দর্যের জন্য আংটি ব্যবহার করা সুন্নত নয়, তবে তা অবৈধও নয়।

❁ পা

পায়ের লেবাস মোজা ও জুতা। ইসলাম মুসলিমকে জুতা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। *(মুসলিম ২০৯৬নং)* যেহেতু জুতা পরে পথ চললে কোন সওয়ারীর উপর চড়ে থাকার মত পা নিরাপদে থাকে, পথ চলতেও আরাম লাগে। জুতা পরার আদব রয়েছে ইসলামে, যা নিম্নরূপ ঃ-

১। জুতা (ও মোজা) পরার সময় ডান পায়েরটা আগে পরুন এবং খোলার সময় বাম পায়েরটা আগে খুলুন।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের যখন কেউ জুতা পরে, তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খোলে, তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। যাতে ডান পায়ের জুতা আগে পরা হয় এবং শেষে খোলা হয়।" *(বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭নং প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, কোন হিংস্র জন্তু মোজার ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারে -এই আশঙ্কায় তা ঝেড়ে পরা উত্তম। তবে তা না ঝেড়ে পরা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস সহীহ

নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৪৪০নং)*

২। জুতা পরার সময় যদি হাত লাগাতে হয় অথবা তার ফিতা বাঁধতে হয়, তাহলে পড়ে যাওয়ার ভয়ে বসে বসে পরুন। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ খাড়া হয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭১৯নং)*

৩। এক পায়ে জুতা দিয়ে পথ চলবেন না। হয়তো বা তাতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি থাকতে পারে। অন্যের চোখে অসভ্য দেখাতে পারে। আর তা ছাড়া এক পায়ে জুতা দিয়ে চলে শয়তান। অতএব পথ চলতে একটি জুতা নষ্ট হয়ে গেলে, অপর জুতাটি পায়ে না রেখে উভয় জুতা হাতে নিয়ে পথ চলুন। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে। *(আহমাদ ৯১৯৯, মুসলিম ২০৯৮, নাসাঈ ৫৩৬৯, বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৮নং)*

৪। কখনো কখনো খালি পায়েও পথ চলুন।

ফাযালাহ বিন উবাইদ যখন মিসরে (বা শামে) আমীর মুআবিয়ার নায়েব ছিলেন, তখন এক সাহাবী (মদীনা থেকে গিয়ে) তাঁকে দেখলেন, তিনি আলুথালু বেশে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার যে, আমি আপনাকে আলুথালু বেশে দেখছি, অথচ আপনি দেশের আমীর?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে অতিরিক্ত বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন।' তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন?' উত্তরে ফাযালাহ বললেন, 'যেহেতু নবী ﷺ আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করতেন।' *(আহমাদ ২৩৪৪৯, আবূ দাউদ ৪১৬০নং)*

বলাই বাহুল্য যে, বিশেষ করে সবুজ ঘাসের উপর চলতে আধুনিক যুগের ডাক্তারগণও উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তা মানুষের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করে।

৫। খালি ময়দানে অথবা মাটির উপর নামায পড়লে এবং জুতা পরিষ্কার থাকলে জুতা পরেই নামায পড়ুন। অবশ্য পবিত্র হলেও কার্পেট বিছানো বা মেঝে বিশিষ্ট মসজিদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে মসজিদ নোংরা করবেন না। বরং নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে নামায পড়ুন। চুরির ভয় হলে ব্যাগে নিয়ে কাছে রেখে নামায পড়ুন।

❁ হাত-পায়ের নখ

নখ কাটা প্রকৃতিগত একটি সুন্নত। নখ ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। মানুষ একটি সভ্য জাতি। সে জাতি এবং বিশেষ করে কোন মুসলিম অসভ্য পশুর সদৃশ হতে পারে না। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম নখ কাটার প্রচলন হযরত ইবরাহীম ؑ।

হাতের নখ কাটার সময় প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাতের নখ কাটতে হয়। পায়ের নখ কাটার সময় ডান পায়ের নখ আগে কাটতে হয়। তবে কোন আঙ্গুলের নখ

আগে কাটতে হয়, তার কোন দলীল নেই। সর্বপ্রথম ডান হাতের কনিষ্ঠা, তারপর মধ্যমা, তারপর বৃদ্ধা, তারপর অনামিকা, তারপর তর্জনী, তারপর বাম হাতের বৃদ্ধা---বলে যে পর্যায়ক্রম বর্ণনা করা হয়, তার কোন দলীল নেই। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, শরীয়তে এর কোন দলীল নেই। এইভাবে নখ কাটা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেহেতু কোন কিছুকে মুস্তাহাব মনে করা শরয়ী বিধান। আর তা প্রমাণের জন্য দলীল জরুরী। *(কাশ্‌শাফুল ক্বিনা' ১/৯৪)*

নখ কাটার পর হাত ধোয়ায় যদি স্বাস্থ্যগত কোন উপকার থাকে, তাহলে তা করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তা সুন্নত বা মুস্তাহাব মনে করে করলে তারও দলীল থাকা জরুরী।

প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নখ লম্বা রাখা হারাম নয়। *(কাশ্‌শাফুল কিনা' ১/৯৪-৯৫)*

❁ লজ্জাস্থান

পুরুষের লজ্জাস্থান হল নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত। এই স্থানকে গুপ্তস্থানও বলা হয়। মানুষের জন্য সে স্থান গুপ্ত রাখা ওয়াজেব। এমনকি একাকী থাকলেও তা প্রকাশ করা বা খুলে রাখা উচিত নয়। তদনুরূপ অপরের ঐ স্থানের দিকে চেয়ে দেখা বৈধ নয়। সামনে কেউ না থাকলেও আল্লাহকে লজ্জা করা ঈমানের অন্যতম পরিচয়। অবশ্য স্ত্রীর কাছে থাকলে সে কথা আলাদা।

মহানবী ﷺ বলেন, "(পুরুষের) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান হল লজ্জাস্থান।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৫৮৩ নং)*

বলা বাহুল্য, নাভির উপরে কাপড় বেঁধে রাখা মুসলিমের কর্তব্য। আর উচিত নয় তার নিচে কাপড় বাঁধা।

আর উরুর ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোন জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৪০ নং)*

অন্যত্র বলেন, "তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থান।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৯০৬ নং)*

❁ গুপ্তাঙ্গের লোম

গুপ্তাঙ্গ গুপ্তই থাকে, তবুও তার (নাভির নিচে এবং প্রস্রাব-পায়খানাদ্বারের আশে-পাশে) গজিয়ে ওঠা লোম পরিষ্কার করে ফেলতে হয় মুসলিমকে। বলা বাহুল্য, মুসলিম কেবল বাহিরেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়; বরং আভ্যন্তরিক ও গোপনীয় বিষয়েও সে বড় সভ্য।

এই লোম চেঁছে ফেলাই সুন্নত। অবশ্য তা কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করে তুলে ফেলাও বৈধ। যেমন চাঁছার যন্ত্র না পাওয়া গেলে অথবা চাঁছা কষ্টকর হলে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলাও দূষণীয় নয়।

পক্ষান্তরে গুপ্তাঙ্গের লোম কাঁচি দ্বারা পরিষ্কার করলে পরিবারে ও জীবনে অশান্তি নেমে আসে এ ধারণা অমূলক।

গুপ্তাঙ্গের লোম আদি (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) পরিষ্কার করতে কোন পুরুষের কাছেও লজ্জাস্থান খোলা বৈধ নয়। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১৩পৃঃ, ইলা রাব্বাতুল খুদূর ১০৩পৃঃ)*

এ লোম কোন্ দিনে কাটতে হবে, তারও কোন প্রমাণ মিলে না। সুতরাং তা যে কোন দিনে কাটা যায়। তবে প্রত্যেক সপ্তাহে জুমআর দিন নখ, মোচ ইত্যাদি কেটে ফেলার কথা ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণনা পাওয়া যায়। *(বাইহাকী ৩/২৩৪)*

অবশ্য সে সব না কেটে ৪০ দিন বেশী পার করা যাবে না। যেহেতু আনাস ﷺ বলেন, 'মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।' *(মুসলিম ২৫৮-নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যাদু থেকে বাঁচার জন্য দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, লোম বা নখ ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলা দূষণীয় নয়। পুঁতে ফেলা আদেশ বা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৩৫৭নং দ্রঃ)*

মানুষ সম্মানিত জীব। তার সকল অংশও সম্মানিত। সুতরাং তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ (নখ) চুল (ইত্যাদি) বিক্রয় করা বৈধ নয়। ইমাম আত্বা চুল বিক্রয়কে ঘৃণিত আচরণ মনে করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৪/ ১২৩)*

❁ খতনা

খতনা করা বালকের জন্য আবশ্যক। এতে রয়েছে পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা ও বহু যৌনরোগের হাত হতে মুক্তির উপায়। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পূর্ণ তৃপ্তি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি। *(বিস্তারিত আদব জানার জন্য 'শিশু প্রতিপালন' দ্রঃ)*

পুরুষের সুগন্ধি ও আতর

মানুষ সভ্য জাতি। সৌন্দর্যের সাথে সৌরভ মানুষের মনে আনন্দ আনে। যেমন নিজে আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি অপরকেও আনন্দ দেওয়া যায়, আকৃষ্ট করা যায়। এ জন্যই ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ। আল্লাহর রসূল ﷺ আতর ব্যবহার করতেন এবং তিনি তা খুব পছন্দ করতেন।

তিনি বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাযকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩১২৪নং)*

অবশ্য এই ব্যবহারের রয়েছে কিছু বিধান।

স্ত্রীর মন আকর্ষণ করার জন্য আতর ব্যবহার বিধেয়। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মনই এক অপরকে নানাভাবে আকর্ষণ করে। আর বিশেষ করে আতর তাদের প্রেমের সমুদ্রে জোয়ার আনে।

যেমন সমাজে যেতে হলে সৌন্দর্য অবলম্বনের সাথে সাথে সুগন্ধি ব্যবহার বিধেয়। ঈদের জামাআতে হাজির হতে খোশবু ব্যবহার বিধেয়।

ইমাম মালেক বলেন, 'আমি আহলে ইল্মদের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রত্যেক ঈদে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহারকে মুস্তাহাব মনে করতেন।'

জুমআর জামাআতে হাজির হওয়ার জন্যও আতর ব্যবহার বিধেয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সাবালকের জন্য জুমআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য।" *(মুসলিম ৮৪৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর) থাকলে তা ব্যবহার করে, উত্তম লেবাস পরিধান করে, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকেদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম) করে না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করে না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমআর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করে এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করে সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যায়।" *(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৭২০নং)*

বিশেষ বিশেষ জায়গায় শরীয়ত আমাদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করে। যেমন হজ্জ বা উমরাহ করতে গিয়ে ইহরাম অবস্থায় সর্বপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখার বিষয় যে, সেন্টে যেন কোহল বা স্পিরিট

মিশ্রিত না থাকে; থাকলে তা ব্যবহার (অনেকের নিকট) বৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/১৮৫, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/২০৩)* অবশ্য এমন সময় ঐ শ্রেণীর সেন্ট্‌ দেহে ব্যবহার করা দূষণীয় নয়, যে সময় ব্যবহারের পর তা গোসলের মাধ্যমে ধোয়া যাবে।

যে সুগন্ধিতে রঙ আছে, তা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

খালূক জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পরিশেষে বলি যে, বাহ্যিক সাজ-সজ্জার সাথে সাথে মানুষকে নিজ হৃদয় ও রসনার সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। নচেৎ বাহ্যিক চমকের কোন দাম থাকে না। মুখ খুললেই তার আসল রূপ ধরা পড়ে যায়। আর তখন তার বাহ্যিক সাজ-সজ্জা তার জন্য হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

জালিনুস এক ব্যক্তিকে দেখলেন, খুব আভিজাত্যসম্পন্ন পোশাক পরে আছে, কিন্তু কথা বলার সময় ভুল বলছে। তা দেখে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যে শ্রেণীর কাপড় পরে আছ ঠিক তেমন ভাবের কথাবার্তা বল, নচেৎ এমন শ্রেণীর কাপড় পর, যেমন ভাবের তোমার কথাবার্তা।'

যেমন কারো বাহ্যিক রূপ-সজ্জা দেখে ধোকা খাওয়াও উচিত নয়। যেহেতু অনেক মানুষ আছে যাদের বাহ্যিক রূপ না থাকলেও আভ্যন্তরিক রূপ অনেক। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে ঠিক এর বিপরীত; যাদের বাহ্যিক রূপের বাহার আছে, কিন্তু ভিতরে সে বড় কুৎসিত। অথচ একটা কুৎসিত মনের চাইতে কুৎসিত চেহারা অনেক ভালো।

একদা নাখ্‌খার উযরী হযরত মুআবিয়ার নিকট এলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি আলখাল্লা। তা দেখে মুআবিয়ার মনে যেন তাচ্ছিল্য ভাব এল। নাখ্‌খার সে কথা তাঁর চেহারায় অনুমান করে নিলেন ও বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! এ আলখাল্লা আপনার সাথে কথা বলবে না, আপনার সাথে কথা বলবে তার পরিধায়ী।' অতঃপর তিনি এমন সুন্দর কথা বললেন, যাতে হযরত মুআবিয়া মুগ্ধ হলেন। তারপর যখন নাখ্‌খার উঠে গেলেন, তখন তিনি বললেন, 'এমন মানুষ কখনো দেখিনি, যে প্রথমে ঘৃণ্য হয় এবং পরে সম্মানার্হ হয়।'

সত্যই তো সুন্দর পোশাক পরিহিত ব্যক্তি মাত্রই ভদ্রলোক নয়। সুতরাং লোকের

পরহেযগারীর পোশাক দেখে ধোকা খাবেন না, গাঁটের অনেক উপরে কাপড় পরা দেখে অবাক হবেন না এবং কপালে সিজদার কালো দাগ দেখে চমকিত হবেন না। বরং সংসার ও টাকা-পয়সার ব্যাপারে দেখুন, তার পরহেযগারী কতটুক?

এক ব্যক্তি হযরত উমারকে বলল, অমুক লোকটা বড় খাঁটি লোক। তিনি বললেন, তা তুমি কিরূপে জানলে? ওর সাথে কোন সময় সফর করেছ? বলল, না। বললেন, তোমার ও ওর মাঝে কোনদিন তর্ক বা মতবিরোধ হয়েছিল? বলল, না। বললেন, ওর কাছে কোনদিন কিছু আমানত রেখেছিলে? বলল, না। বললেন, তাহলে ওর সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। আমার মনে হয়, তুমি ওকে মসজিদে মাথা হিলাতে দেখেছ। *(উয়ূনুল আখবার ৩/ ১৫৮)*

আবার বলি যে, মানুষের বেশভূষা ও বাহ্যিক আড়ম্বর দেখে ধোকা খাওয়া উচিত নয়। মুর্দার উপর বহু মূল্যের কাফন থাকলে কি তার মান বাড়ে?

মহিলার সাজ-সজ্জা

মহিলার লেবাসের শর্ত অনুসারে আমরা বুঝতে পারি যে টাইট্‌ফিট চুস্ত্ পোশাক কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়ির ভিতর পরিধান বৈধ। অবশ্য কোন এগানা ও মহিলার সামনে, এমন কি পিতা-মাতা বা ছেলে-মেয়েদের সামনেও ব্যবহার উচিত নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৫)*

যে পোশাকে অথবা অলঙ্কারে কোন প্রকারের মানুষ বা জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কিত থাকে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেহেতু ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী। *(আল-ফাতাওয়া আল-ইজতিমাইয়্যাহ, ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন ৪০পৃঃ)*

যে লেবাস বা অলঙ্কারে ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা, ক্রুশ, শঙ্খ, সর্প বা অন্যান্য কোন বিজাতীয় ধর্মীয় প্রতীক (অথবা হারাম বাদ্য-যন্ত্র) চিত্রিত থাকে মুসলিমের জন্য তাও ব্যবহার করা বৈধ নয়। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ৭পৃঃ)*

সোনা, রূপা বা অন্য কোন ধাতুর অলংকারে কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর নাম অঙ্কিত করে তা দেহে ব্যবহার করা বৈধ নয়। *(ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ১/৪৫৮)* বৈধ নয় কোন শির্কী কথা অঙ্কিত করে মঙ্গল আনয়ন এবং অমঙ্গল দূরীকরণের ব্যবস্থা।

নিউ মোডেল বা ফ্যাশনের পরিচ্ছদ ব্যবহার তখনই বৈধ, যখন তা পর্দার কাজ দেবে এবং তাতে কোন হিরো-হিরোইন বা কাফেরদের অনুকরণ হবে না। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১২পৃঃ)*

স্ক্যার্ট-ব্লাউজ বা স্ক্যার্ট-গেঞ্জি মুসলিম মহিলার ড্রেস নয়। বাড়িতে এগানার সামনে সেই ড্রেস পরা উচিত; যাতে গলা থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত পর্দায় থাকে। আর (বিনা বোরকায়) বেগানার সামনে ও বাইরে গেলে তো নিঃসন্দেহে তা পরা হারাম। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ২ ১পৃঃ)*

প্যান্ট-শার্ট মুসলিমদের ড্রেস নয়। কিছু শর্তের সাথে পুরুষদের জন্য পরা বৈধ হলেও মহিলারা তা ব্যবহার করতে পারে না; যদিও তা ঢিলেঢালা হয় এবং টাইটফিট না হয়। এই জন্য যে, তা হল পুরুষদের ড্রেস। আর পুরুষের বেশধারিণী নারী অভিশপ্তা। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ৩০-৩১পৃঃ)*

❁ মহিলার মাথা

মহিলার মাথার কেশ একটি প্রকৃতিগত সৌন্দর্য। সুকেশিনী নারী মুগ্ধ করে তার স্বামীর চক্ষু ও মন। সুতরাং সেই সৌন্দর্যেরও আদব রয়েছে ইসলামে।

কেশবিন্যাসে মহিলার সিঁথি হবে মাথার মাঝে। এই অভ্যাসের বিরোধিতা করে সে মাথার এক সাইডে সিঁথি করতে পারে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৭)* সাধারণতঃ বাঁকা সিঁথির এ ফ্যাশন দ্বীনদার মহিলাদের নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক; যার দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২১২৮নং)*

উক্ত হাদীসে 'মাইলাত' (আকৃষ্টা)র ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, যারা মাথার একপাশে বাঁকা সিঁথি কাটে। যা সাধারণতঃ বেশ্যাদের অভ্যাস। *(শারহুন নওবী দ্রঃ)*

বেণী বা চুঁটি গেঁথে মাথা বাঁধাই উত্তম। খোঁপা বা লোটন মাথার উপরে বাঁধা অবৈধ। পিছন দিকে ঘাড়ের উপর যদি কাপড়ের উপর তার উচ্চতা ও আকার নজরে আসে তবে তাও বৈধ নয়। মহিলার চুল বেশী বা লম্বা আছে -একথা যেন পরপুরুষে আন্দাজ না করতে পারে। যেহেতু নারীর সুকেশ এক সৌন্দর্য; যা কোন প্রকারে বেগানার সামনে প্রকাশ করা হারাম। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩০, ফাতাওয়াল মারআহ ৯৪পৃঃ)*

অনুরূপ কারণে বৈধ নয় গাডার বা ক্লিপ দিয়ে সমস্ত চুলকে পিছন দিকে টাইট করে গোড়ায় বেঁধে ঘোড়ার লেজের মত উঁচু করে ছেড়ে রাখা।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উঁটের কুঁজের মত (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!" *(আহমাদ ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৮৩নং)*

এ ভবিষ্যৎবাণী যে কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না!

মাথার ঝরে-পরা-কেশ মাটিতে পুঁতে ফেলা উত্তম। যেহেতু বিশেষ করে মহিলার চুল উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ হলে তা যুবকদের মন কাড়ে। পরন্তু ঐ চুল নিয়ে যাদুও করা যায়। তাই যেখানে-সেখানে না ফেলাই উচিত। *(ফাতাওয়াল মারআহ ৯৯পৃঃ)*

মহিলার চুল ও কেশদাম অমূল্য সম্পদ, তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

মহিলারা পাকা চুলে খেযাব বা কলপ ব্যবহার করতে পারে। তবে কালো রঙের কলপ ব্যবহার হারাম। বাদামী, সোনালী, লালচে প্রভৃতি কলপ দিয়ে রঙাতে পারে। তবে তাতে যেন কোন হিরোইন বা কাফের নারীর অনুকরণ বা বেশধারণ উদ্দেশ্য না হয়। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ২৫পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত, সালেহ আল ফাউযান ৩০পৃঃ)*

সতর্কতার বিষয় যে, এক প্রকার মোটা কলপ চুলে দিলে, গোসলের সময় চুলে পানি পৌঁছে না। সুতরাং তা থাকা অবস্থায় ফরয গোসল শুদ্ধ হবে না।

সিঁথিতে সিঁদুর দিতে এই জন্য পারে না যে, সলফ মহিলাগণ সিঁথিতে রঙ ব্যবহার করেননি। তাছাড়া তাতে বিজাতির অনুকরণ হবে। যেহেতু কোন কোন ধর্মের মহিলাদের ধর্মীয় অভ্যাস ছিল যে, বিবাহের পর সতীত্ব প্রমাণের জন্য প্রথম রমণে সতীচ্ছদ ছিন্ন হওয়ার ফলে ক্ষরিত রক্ত কপালে লাগিয়ে দেখাতো। যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে রক্তের বদলে সিঁদুর প্রচলিত হয়ে যায়। অতএব মুসলিম মহিলার জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

ইসলামে সধবা বা এয়োতির কোন নির্দিষ্ট চিহ্ন নেই। বিবাহিতা-অবিবাহিতা চেনার কোন উপায় নেই। তা চিনে কোন ফায়দাও নেই। তাছাড়া সে তো অচেনাদের কাছে পর্দার অন্তরালে অবস্থান করবে। অতএব সে সব চিহ্ন দেখার সুযোগই কোথায়?

মহিলাদের মাথার চুল নেড়া করা হারাম। অবশ্য সৌন্দর্যের জন্য সামনের বা পিছনের কিছু চুল ছাঁটা অবৈধ নয়। তবে তা কোন হিরোইন বা কাফের মহিলাদের অনুকরণ করে তাদের মত অথবা পুরুষদের মত করে ছেঁটে 'ডিয়ানা-কাট', 'লায়ন-কাট', 'র‍্যাট-কাট', 'সাধনা-কাট', 'হিপ্পি-কাট' ইত্যাদি অবৈধ। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৬-৮৩১, ফাতাওয়াল মারআহ ১০৭-১১১পৃঃ)*

তাছাড়া সুদীর্ঘ কেশদাম সুকেশিনীর এক মনোলোভা সৌন্দর্য, যা ছেঁটে নষ্ট না করাই

উত্তম। *(ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৫১২-৫১৫)*

স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে - অর্থের অপচয় না হলে - মেশিন দ্বারা চুল কুঁচকানো বা থাক্‌থাক্‌ করা বৈধ। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৯)* তবে তা কোন পুরুষ সেলুনে অবশ্যই নয়। মহিলা সেলুনে মহিলার নিকট এসব বৈধ। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১৩পৃঃ, রাখুঃ ১০৩পৃঃ)*

কেশ বেশী দেখাবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম চুল বা পরচুলা (টেসেল) অথবা বস্ত্রখন্ড বা তুলোর বল আদি ব্যবহার হারাম, স্বামী চাইলেও তা মাথায় লাগানো যাবে না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার মাথায় এমন চুল বাড়তি লাগায় যা তার মাথার নয়, সে তার মাথায় জালিয়াতি সংযোগ করে।" *(সহীহুল জামে' ২৭০৫নং)*

হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি মুআবিয়া ﷺ এর হজ্জের বছরে মিম্বরের উপর তাঁকে বলতে শুনেছেন। তিনি এক প্রহরীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের উলামাগণ? আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মুখে শুনেছি, তিনি এ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হল যখনই তাদের মেয়েরা এই (পরচুলা) ব্যবহার শুরু করল।" *(মালেক, বুখারী ৩৪৬৮, মুসলিম ২১২৭নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

ইবনুল মুসাইয়িব কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুআবিয়া মদীনায় এসে আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। আর (তারই মাঝে) এক গোছা পরচুলা বের করে বললেন, 'ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কোন (মুসলিম) ব্যক্তি এ জিনিস ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এই (পরচুলা ব্যবহারের) খবর পৌঁছলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, 'জালিয়াতি!' *(বুখারী ৫৯৩৮নং)*

যে মেয়েরা মাথায় পরচুলা লাগিয়ে বড় খোঁপা প্রদর্শন করে আল্লাহ রসূল ﷺ তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৫১০৪নং)*

একজন মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ের হাম হয়েছিল। যার ফলে তার মাথার চুল (অনেক) ঝরে গেছে। আর তার বিয়েও দিয়েছি। অতএব তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি কি?' নবী ﷺ বললেন, "পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেওয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আসমা বলেন, 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

অবশ্য কোন মহিলার মাথায় যদি আদৌ চুল না থাকে, তবে ঐ ত্রুটি ঢাকার জন্য তার পক্ষে পরচুলা ব্যবহার বৈধ। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩৬, ফাতাওয়াল মারআহ ৮৩পৃঃ)*

❁ মাথার পোশাক ও অলঙ্কার

মহিলার মাথার পোশাক হল ওড়না। অবশ্য তা পাতলা হবে না এবং তা দিয়ে মাথা সহ ঘাড় ও বক্ষঃস্থল ঢাকা যাবে। আর তার মাথার যাবতীয় অলঙ্কার; টায়রা, ক্লিপ, চুল-আঁটা, বেল্ট্ প্রভৃতি মহিলা, স্বামী ও মাহরাম আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পারবে না।

❁ কান ও তার অলঙ্কার

কান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামত। এই নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব কানে তাই শোনা উচিত, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুমতি আছে। আল্লাহর দেওয়া এই কান দিয়ে গান-বাজনা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি শোনা হারাম। হারাম কানাচি পেতে কারো গোপন কথা শোনা।

কান ফুঁড়িয়ে অলঙ্কার ব্যবহার মহিলার জন্য বৈধ। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম বিবি হাজার (হাজেরা) কান ফুঁড়িয়েছিলেন। *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১/ ১৫৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে মহিলারা কান ফুঁড়িয়ে তাতে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। একদা মহানবী ﷺ ঈদের খুতবায় মহিলাদেরকে নসীহত করে সদকাহ করতে বললেন। তা শুনে মহিলারা নিজ নিজ কানের অলংকার ও হাতের আংটি সদকাহ করেছিলেন। *(বুখারী ৯৮, মুসলিম ৭৯নং)*

❁ চেহারা

চেহারা দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল ও দর্শনীয় অঙ্গ। সুন্দর-অসুন্দর বিবেচিত হয় এই অঙ্গেরই নিকষে। তাই তো বেগানার কাছে মর্যাদাসম্পন্না স্বাধীনা মহিলারা তাও গোপন করে থাকেন। তাই তো শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে যে, মহিলা আঘাতের উপযুক্তা হলেও তার চেহারায় যেন আঘাত না করা হয়।

চেহারার রঙ উজ্জ্বল করার জন্য কোন মেডিসিন দিয়ে চেহারার উপরিভাগের ছাল তুলে ফেলা বৈধ নয়। বৈধ নয় প্লাস্টিক সার্জারি করে নতুন রূপ আনয়ন করা। বৈধ নয় বৃদ্ধার ভাঁজ পড়া চেহারা থেকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাঁজ দূর করে যুবতীর নকল রূপ আনয়ন করা। যেহেতু এ কাজও আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যে রূপ দান করেছেন, মহিলাকে সেই রূপ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অর্থ আছে বলে অর্থের অপচয় ঘটিয়ে ধার করা রূপ আনাতে ইসলামের সম্মতি নেই। অবশ্য বিকৃত মুখমন্ডল অথবা কোন অঙ্গ স্বাভাবিক রূপে ফিরিয়ে আনতে ইসলাম অনুমতি দেয়।

দেগে মুখে-হাতে নক্সা করা বৈধ নয়। এরূপ দেগে নক্সা যে বানিয়ে দেয় এবং যার

জন্য বানানো হয় উভয়কেই নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৫১০৪নং, তামবীহুল মু'মিনাত ২৯পৃঃ)*

মহিলার চেহারায় যদি অস্বাভাবিক লোম গজিয়ে ওঠে; যেমন গালে, ঠোঁটে বা চিবুকে লোম দেখা দেয়, তাহলে তা যে কোন প্রকারে দূর করে স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়ে আনাতে কোন দোষ নেই। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমাহ ২১৭৭৮-নং)*

❁ কপাল

ইসলামে মহিলাদের জন্য কপালে ব্যবহার্য কোন অলঙ্কার বা সাজ-সজ্জার বিধান নেই। সুতরাং সেখানে কোন রঙ (ফোঁটা, টিপ) বা অলঙ্কার ব্যবহার যদি অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ করে হয়ে থাকে তাহলে তা অবৈধ। বিশেষ করে লাল টিপ ও ফোঁটাতে ঐ ছিন্ন সতীচ্ছদের রক্তের রং ও রূপ রয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

❁ ভ্রূ ও তার সৌন্দর্য

ভ্রূর রূপ হল প্রকৃতিগত। তাতে আল্লাহর দেওয়া রূপ মানুষের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তা চেঁছে সরু চাঁদের মত করে সৌন্দর্য আনয়ন বৈধ নয়। স্বামী চাইলেও নয়। যেহেতু ভ্রূ ছেঁড়া বা চাঁছাতে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয়; যাতে তাঁর অনুমতি নেই। তাছাড়া নবী ﷺ এমন মেয়েদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৫১০৪নং, ফাতাওয়াউল মারআহ ৭২,৯৪পৃঃ)* অনুরূপ কপাল চেঁছেও সৌন্দর্য আনা অবৈধ। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৬৯২)*

অনুরূপভাবে ভ্রূর লোমকে অথবা চামড়াকে কোন রঙ বা কেমিক্যাল দিয়ে রঙিয়ে রূপসী সাজাও বৈধ নয়।

❁ চোখ ও তার প্রসাধন

মহিলার উচিত, প্রত্যেক হারাম জিনিস দেখা হতে চক্ষুকে অবনত ও সংযত করা। চোখের চাহনিকে বোরকার পর্দায় গোপন করা, আঁখির বাঁকা ছুরিকে কোন পরপুরুষের গলায় চালানো থেকে বিরত থাকা। চোখ ঠারা, চোখ মারা ও চোখের অবৈধ ইশারা থেকে দূরে থাকা। চোখের ব্যভিচার থেকে শত ক্রোশ তফাতে থাকা।

সুর্মা সুরমার চোখে মনোরমা লাগে এবং তা ব্যবহার সুন্নত। কাজলে চোখের কোন ক্ষতি না থাকলে তা ব্যবহার বৈধ, নচেৎ না। পলকের পালিশ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই বিধান। জেনে রাখা দরকার যে, ঐ সকল রঙ এমন কেমিক্যাল (রাসায়নিক পদার্থ) দিয়ে তৈরী থাকে যে, তা ব্যবহার করলে চোখের নানা রোগ দেখা দিতে পারে। এই জন্যই মহিলাদের উচিত, এমন পেন্ট্ লাগিয়ে সঙ বা হিরোইন সাজার চেষ্টা না করা।

চোখের পাতার উপর প্রকৃতিগতভাবে যে লোম থাকে, মহিলাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট

থাকা উচিত। সুনয়না সাজার জন্য নকল লোম ব্যবহার তার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তা নকল চুল (পরচুলা) ব্যবহার করারই অনুরূপ।

চিকিৎসার খাতিরে কন্‌ট্যাক্ট লেন্স্ (নেত্রপল্লবের ভিতরে স্থাপিত প্লাস্টিক-নির্মিত পরকলা) ব্যবহার বৈধ। কিন্তু সুন্দরী সাজার জন্য বিভিন্ন রঙের কসমেটিক লেন্স্ ব্যবহার বৈধ নয়।

চোখে চশমা যদি প্রয়োজনে হয়, তাহলে অবৈধ নয়। কিন্তু গগল্‌স লাগিয়ে মস্তান সাজা কোন দ্বীনদার মহিলার কাজ নয়।

❁ গাল ও তার প্রসাধন

মহিলার জন্য বাজারে অসংখ্য (আসল ও নকল) গালের ক্রিম ও প্রসাধন পাওয়া যায়। এ সব ব্যবহার কেবল একটা ভিত্তিতে বৈধ এবং তা এই যে, তা ব্যবহারে মহিলার যেন উপকার থাকে এবং কোন প্রকার অপকার না থাকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মহিলা তা কোন ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবহার না করে এবং মাসে মাসে একটার পর আর একটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে করতে গালের ত্বকই নষ্ট করে ফেলে। অথচ নানা ক্রিম ও পাউডারের প্রলেপ হল গালে মেছেতা বা অন্য অবাঞ্ছিত দাগ পড়ার অন্যতম কারণ। সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলিম মা-বোনদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহিলার গালে বা ওষ্ঠের উপরে পুরুষের দাড়ি-মোচের মত দু-একটা বা ততোধিক অস্বাভাবিক চুল থাকলে তা তুলে ফেলায় দোষ নেই। কারণ, বিকৃত অঙ্গে স্বাভাবিক আকৃতি ও শ্রী ফিরিয়ে আনতে শরীয়তের অনুমতি আছে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩২, ফাতাওয়া মারআহ ৯৪পৃঃ)*

অবশ্য অনেকের মতে আল্লাহর দেওয়া ঐ শ্রী নিয়ে মহিলাকে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যেহেতু মহান আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকেই সুন্দর আকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৪০৯)* অল্লাহু আ'লাম।

❁ নাক, নাকের পরিচ্ছন্নতা ও অলঙ্কার

নাক পানি দিয়ে পরিষ্কার রাখা প্রকৃতিগত একটি সুন্নত। আর তার জন্য রয়েছে ওযূর বিধান।

নাক ছিদ্র করার প্রথা মহানবী ﷺ বা তাঁর সাহাবার যুগে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দেশের প্রথা হিসাবে মহিলা নাক ফুড়িয়ে তাতে কোন অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারে। *(ফাতাওয়া মারআহ ৮২পৃঃ)* ব্যবহার করতে পারে লাগামের মত নাকের নথ। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ৪/ ১৩৭)*

❁ ওষ্ঠাধর

প্রকৃতিগতভাবে মহিলার গোঁফ হয় না। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে তা যদি হয়েই থাকে, তাহলে তা তুলে ফেলা বৈধ; যেমন এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

স্বামীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের জন্য ঠোঁট-পালিশ (লিপস্টিক), গাল-পালিশ প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যবহার বৈধ; যদি তাতে কোন প্রকার হারাম বা ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত না থাকে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৯)*

প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন প্রসাধন কোম্পানী গর্ভচ্যুত ভ্রূণ ও আরশোলা (তেলেপোকা) দ্বারা মেয়েদের প্রিয় অঙ্গরাগ 'লিপস্টিক' প্রস্তুত করে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত খবরটি অনেকের অবিশ্বাস্য হলেও, তা কিন্তু সত্য। সুতরাং ঠসকী ও ভাবুনী মা-বোনেরা সাবধান হবেন কি? নাকি সেই বরাঙ্গীর মত বলবেন - যে বরাঙ্গীর ঘরে আগুন লাগলে সে তার সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত ছিল এবং এক মহিলা যখন তাকে বলল, 'বরাঙ্গী লো, বরাঙ্গী! তোর ঘর পুড়ছে যে!' তখন তার উত্তরে সে বলল, 'পুড়ুকগে, আমার বরাঙ্গ তো পুড়েনি!'

❁ দাঁত, দাঁতের যত্ন

দাঁতের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে পুরুষের মত মহিলারও দাঁতন করার বিধান রয়েছে ইসলামে।

রূপচর্চায় দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান ঘষে ফাঁক-ফাঁক করে চিরনদাঁতীর রূপ আনা বৈধ নয়। এমন নারীও নবী ﷺ-এর মুখে অভিশপ্তা। *(সহীহুল জামে' ৫১০৪নং, আদাবুয যিফাফ ২০৩পৃঃ)*

অবশ্য কোন দাঁত অস্বাভাবিক ও অশোভনীয় রূপে বাঁকা বা অতিরিক্ত (কুকুরদাঁত) থাকলে তা সিধা করা বা তুলে ফেলা বৈধ। *(তামবীহুল মু'মিনাত ২৮পৃঃ, ফাতাওয়া মারআহ ৯৪পৃঃ)*

যেমন মহিলার জন্য সোনার দাঁত ব্যবহার করা বৈধ।

❁ ঘাড় ও গলা

মহিলাদের ঘাড়ের অলঙ্কার হিসাবে হার ও মালা পরার প্রথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগেও প্রচলিত ছিল। *(বুখারী ৫৮৮১নং)* সুতরাং তা আজও মহিলার সৌন্দর্যবর্ধক এক শ্রেণীর অলংকার।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহিলার গলার আওয়াজ বেগানা পুরুষের জন্য শোনা বৈধ হলেও তার কণ্ঠস্বরে যেন মিষ্টতা ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা না থাকে। রোগা মনের পুরুষ যাতে তার কোমল কণ্ঠে প্রলুব্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য কুরআনে এ বিধান দেওয়া হয়েছে। *(সূরা আহযাব ৩২ আয়াত)*

❁ বক্ষঃস্থল

নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য গোপন থাকে তার বুকের মাঝে। সেহেতু বক্ষঃস্থল তার একান্ত গোপনীয় অঙ্গ। লেবাসের ভিতরেও এ অঙ্গ আকর্ষণীয় (উঁচু) করে রাখা বোরকা-ওয়ালীদের জন্যও বৈধ নয়।

কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্রা ব্যবহার বৈধ। অন্যের জন্য ধোকার উদ্দেশ্যে তা অবৈধ। *(ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ১/৪৭০)*

বক্ষের ভিতরে আছে হৃদয়। এই হৃদয় হল মানুষের মূল। হৃদয় ভালো হলে, তার সব ভালো। নচেৎ তা খারাপ হলে সব খারাপ। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক দেহে সৌন্দর্য আনার আগে হৃদয়-মনে সৌন্দর্য আনতে হবে। দেহের সৌন্দর্য নিবেদন করার সাথে সাথে হৃদয়ের সৌন্দর্যও নিবেদন করতে হবে স্বামীকে। তবেই হবে সৌন্দর্যের প্রকৃত মূল্যায়ন।

আসলে আত্মার সৌন্দর্য মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। আর সত্যিকারের সৌন্দর্য মনের চোখ দিয়েই দেখা যায়।

❁ হাত ও তার অলঙ্কার

মেহেন্দি লাগিয়ে হাত রঙিয়ে রাখাই মহিলার কর্তব্য। যাতে মহিলার হাত থেকে পুরুষের হাত পৃথক বুঝা যায়। মহানবী ﷺ-এর যুগে মহিলারা মেহেন্দি দ্বারা রঙিয়ে রাখত।

হাতের চুড়ি প্রচলিত ছিল তখনও। অবশ্য তা এয়োতির চিহ্নরূপে প্রচলিত ছিল না। বলাই বাহুল্য যে, বিবাহিত মহিলার হাতে চুড়ি রাখা জরুরী ভাবা, চুড়ি খুললে স্বামীর কোন ক্ষতি হবে ধারণা করা অথবা হাত খালি করতে নেই মনে করা শির্ক ও বিদআত।

যেমন বেগানা পুরুষের হাতে চুড়ি পরা মুসলিম মহিলার জন্য হারাম ও অতি ধৃষ্টতার পরিচয়। হারাম হল চুড়ির ঝন্‌ঝনানি দ্বারা পর-পুরুষের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

হাতের বাজুতে বাজুবন্দ বা আর্মলেট, হাতে ঘড়ি বা ব্রেসলেট ব্যবহার অবৈধ নয়। তবে তা বেগানা পুরুষের চোখের সামনে গোপন করতে হবে।

অনেকের মতে মহিলার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাতও গোপনীয় অঙ্গ। অতএব তা বেগানা পুরুষের সামনে বোরকা বা চাদর দ্বারা অথবা হাত মোজা বা দস্তানা দ্বারা পর্দা করা ওয়াজেব। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে মহিলারা দস্তানা ব্যবহার করত। তাই ইহরামের সময় তা পরতে নিষেধ করা হয়েছে।

হাতের চামড়া দেগে নকশা করা বৈধ নয়। এমন যে করে ও করায় সে অভিশপ্তা।

হযরত ইবনে মসঊদ رضي الله عنه বলতেন, '(হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (বা ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য

যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।'

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ ﵁-কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।' ইবনে মসঊদ ﵁ বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?'

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' ইবনে মসঊদ ﵁ বললেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, 'কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' ইবনে মসঊদ ﵁ বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসঊদ ﵁ তাকে বললেন, 'যদি তাই হত তাহলে আমি তার সাথে সহবাস (বা সহাবস্থান)ই করতাম না।' *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

❁ আঙ্গুল ও তার সৌন্দর্য

মহানবী ﷺ-এর যুগে মহিলারা আংটি ব্যবহার করত। তবে লোহার আংটি ব্যবহার বৈধ নয়। বৈধ নয় পয়গামের আংটি। যেমন কোন বালা-মসীবত দূর করার জন্য কোন আংটি ব্যবহার করা শির্ক।

কোন বিকৃত অঙ্গে সৌন্দর্য আনয়নের জন্য অপারেশন বৈধ। কিন্তু ত্রুটিহীন অঙ্গে অধিক সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার করা বৈধ নয়। *(ফাতাওয়াল মারআহ ৯২পৃঃ)* পক্ষান্তরে অতিরিক্ত আঙ্গুল বা মাংস হাতে বা দেহের কোন অঙ্গে লটকে থাকলে তা কেটে ফেলা বৈধ। *(যীনাতুল মারআতিল মুসলিমাহ ১২২ পৃঃ)*

কোন আঙ্গিক ত্রুটি ঢাকার জন্য কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার দূষণীয় নয়। যেমন, সোনার বাঁধানো নাক, দাঁত ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩৩)*

۞ পা ও তার অলঙ্কার

মহিলাদের পায়ের অলঙ্কার নবী ﷺ-এর যুগেও প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও পায়ের মল, নুপুর বা তোড়া যদি বাজনাহীন হয় এবং বেগানা পুরুষ থেকে গুপ্ত রাখা হয়, তাহলে তা বৈধ।

মহিলার পায়ে ঘুঙুর ও বাজনাবিশিষ্ট নুপুর স্বামী ও এগানা ছাড়া অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়া হারাম। যেহেতু প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে। আর সেই শয়তান পর-পুরুষের মন ও দৃষ্টিকে ঐ ভাবুনী মহিলার দিকে আকৃষ্ট করে। সে মহিলা হয়তো বা নিজে পর-পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং পর-পুরুষকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। তাইতো সৃষ্টিকর্তা মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেন,

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ (النور ٣١)

অর্থাৎ, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে----। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

অনেকের মতে মহিলাদের জন্য বেগানার সামনে পায়ের পাতা ঢাকাও ওয়াজেব। আর তার জন্য পা-মোজা ব্যবহার করা কর্তব্য।

۞ জুতার আদব

মহিলাদের জন্য হিল তোলা জুতা ব্যবহার বৈধ নয়। বিশেষ করে পেনসিল হিল জুতা মুসলিম মহিলাদের জন্য পরাই উচিত নয়।

হাই হিল জুতা পরা একাধিক কারণে নিষিদ্ধ ঃ-

(ক) নিজেকে লম্বা দেখাবার উদ্দেশ্যে এই জুতা পরার মানে হল, আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতির ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ।

(খ) লম্বা ও উঁচু দেখানোর উদ্দেশ্যে পরলে লোককে ধোকা দেওয়া হয়।

(গ) এই জুতা পরে মহিলার পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী থাকে। আর যদি কোন লোকমাঝে পড়ে, তাহলে তার উপর হাততালি ও উপহাসের পাথর বর্ষণ করা হয়। আর বেকায়দায় বা খারাপ জায়গায় পড়লে বেপর্দা হয় অথবা দেহে আঘাত খায়।

(ঘ) এই জুতা পরে আকর্ষণীয় আওয়াজ এবং চলনে দৃষ্টি-আকর্ষী আজব ভঙ্গিমা সৃষ্টি হয়। তাতে পুরুষের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হয়। *(ইলা রাব্বাতিল খুদূর, আবু আনাস আলী ৮৬পৃঃ)*

(ঙ) এই জুতা পরলে পশ্চিমা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়।

(চ) এই জুতা পরে মনে মনে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হতে পারে।

(ছ) এই জুতা পরে স্বাস্থ্যগত অনেক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। যেমন ঃ পিঠে ব্যথা হয়,

পায়ের রলার পেশী শক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি।

আসলে এই শ্রেণীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষী জুতা পরে যে মহিলা প্রদর্শন করে বেড়ায়, সে আসলে সেই মহিলাদের দলভুক্ত হতে পারে, যাদের সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন, "--এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২ ১২৮-নং)*

অতএব ঐ শ্রেণীর অন্ধ মেয়েরা দৃষ্টি ফিরে পাবে কি?

প্রকাশ থাকে যে, হাত-পায়ের অতিরিক্ত লোম তুলে ফেলে সৌন্দর্য আনয়ন করা মহিলার জন্য বৈধ।

❁ হাত-পায়ের নখ

নখ কেটে ফেলা মানুষের এক প্রকৃতিগত রীতি। প্রতি সপ্তাহে একবার না পারলেও ৪০দিনের ভিতর কেটে ফেলতে হয়। *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ ২০৬পৃঃ)* কিন্তু এই প্রকৃতির বিপরীত করে কতক মহিলা নখ লম্বা করায় সৌন্দর্য আছে মনে করে। অথচ সভ্য দৃষ্টিতে তা পশুবৎ লাগে এবং ঐ নখে নানা ময়লা জমা হতে থাকে। নিছক পাশ্চাত্যের মহিলাদের অনুকরণে অসভ্য লম্বা ধারালো নখে নখ-পালিশ লাগিয়ে বন্য সুন্দরী সাজে। কিন্তু "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে সে সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, আদাবুয যিফাফ ২০৫পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, কৃত্রিম নখ ব্যবহারে উলামাগণ অনুমতি দেন না। যেহেতু তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

নখে নখপালিশ ব্যবহার অবৈধ নয়, তবে ওযুর পূর্বে তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ ওযু হবে না। *(ইলা রাব্বাতিল খুদূর ১০১পৃঃ)* অবশ্য এর জন্য উত্তম সময় হল মাসিকের কয়েক দিন। তবে গোসলের পূর্বে অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে।

মহিলাদের চুলে, হাতে ও পায়ে মেহেন্দী ব্যবহার মাসিকাবস্থাতেও বৈধ। বরং মহিলাদের নখ সর্বদা মেহেন্দী দ্বারা রঙ্গিয়ে রাখাই উত্তম। *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৪৬৭নং)* এতে এবং অনুরূপ আলতাতে পানি আটকায় না। সুতরাং না তুলে ওযু-গোসল হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়াল মারআহ ২৬পৃঃ)*

❁ লজ্জাস্থান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহিলার দেহের প্রায় সবটাই হল লজ্জাস্থান। সুতরাং সেই লজ্জাস্থানকে পোপন করে লজ্জাশীলতা আনয়ন করা মহিলার একটি প্রকৃতিগত

স্বভাব। আর এই প্রকৃতিগত লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তায়ই রয়েছে মহিলার প্রকৃত সৌন্দর্য। আর সে সৌন্দর্য দেখার অধিকারী হল একমাত্র স্বামী।

লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার ব্যাপারে পুরুষের মতই মহিলারও বিধান রয়েছে। অবশ্য পুরুষের চেয়ে মহিলাই এ বিষয়ে অধিক তৎপর।

প্রকাশ থাকে যে, গুপ্তাঙ্গের লোম আদি (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) পরিষ্কার করতে কোন মহিলার কাছেও লজ্জাস্থান খোলা বৈধ নয়। *(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১৩পৃঃ, ইলা রাব্বাতিল খুদূর ১০৩পৃঃ)*

মহিলাদের জন্য খতনার বিধান আছে ইসলামে। তবে পুরুষের মত জরুরী হিসাবে নয়। মুস্তাহাব হিসাবে তা কেউ চাইলে করতে পারে। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম বিবি হাজার (হাজেরা) খতনা করেছিলেন। *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১/ ১৫৪)*

মহিলার সুগন্ধি ও আতর

মহিলার রূপ ও সৌন্দর্যের সাথে সুগন্ধি হল স্বামীর মন আকৃষ্ট করার জন্য আজব যাদু। ঘরে একাকিনী অথবা কেবল মহিলাদের মাঝে থাকলে সেন্ট্ ব্যবহার তার জন্য বৈধ। স্বামীর জন্য ব্যবহার করা বিধেয়। গোলাপের সৌন্দর্যের সাথে সৌরভের মিলন না থাকলে গোলাপের কদর থাকে না। এ জন্যই স্বামী-সোহাগিনী স্ত্রীদের কাছে সেন্ট্ অতি প্রিয় জিনিস।

মহিলা আতর ব্যবহার করবে কেবল নিজের জন্য এবং নিজের স্বামীর জন্য। স্বামী যেন তার নিকট থেকে কোন দুর্গন্ধ না পায় তার খেয়াল রাখতে হয় তাকে। আসলে প্রেম এমন সূক্ষ্ম জিনিস, যা সামান্য কারণে সৃষ্টি হয়; কিন্তু সামান্য কারণে নষ্টও হয়। তাই প্রেমের মাটিতে যাতে কোন প্রকার ঘৃণার বীজ রোপিত না হয়, তার খেয়াল দম্পতিকে অবশ্যই রাখতে হয়। আর সেই মানসেই মাসিক শেষে মহিলাদেরকে লজ্জাস্থানে সুগন্ধি রেখে দুর্গন্ধ দূর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাসিক বন্ধ হওয়ার পর মহিলা সারা শরীর ধুয়ে নেবে। পরে বস্ত্রখন্ডে বা তুলোর মধ্যে কোন সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রেখে নেবে। *(বুখারী ৫৮০৩, মুসলিম, ১১৭৭, মিশকাত ৪৩৭নং)*

পক্ষান্তরে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য সেন্ট্ ব্যবহার করা কোন মহিলার জন্য বৈধ নয়। বিশেষ করে পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন মেয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করলে, সে ভালো মেয়ে নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সে

ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।” *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৪৫৪০নং)*

এমন কি আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতেও সেন্ট্ ব্যবহার করতে পারে না কোন মহিলা।

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে’ ৭৪৫৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।” *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী; সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১ নং)*

তদনুরূপ স্বামী মারা গেলে তার শোকপালনের সময়কালে বিধবার জন্য সর্বপ্রকার সুগন্ধি; সুবাসিত সাবান বা তৈলাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮১৩)* এমন কি নিজের ছেলেমেয়ে বা অন্য কাউকে সেন্ট্জাতীয় কিছু লাগিয়ে দিতেও পারে না। যেহেতু সুগন্ধি হাতে এসে যাবে তাই। *(কিতাবুদ দা’ওয়াহ ২/১৪৩)* অবশ্য মাসিক থেকে পবিত্রতার সময় দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থে কিছু সেন্ট লজ্জাস্থানে ব্যবহার করতে পারে। *(লিক্বাউল বা-বিল মাফতুহ, ইবনে উসাইমীন ২৪/১৩)*

সতর্কতার বিষয় যে, অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মহিলামহলে মহিলাদের আপোসে গর্ব করা এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ক্ষণে ক্ষণে ‘ড্রেস চেঞ্জ্’ করা বা অলঙ্কার বদলে পরা বা ডবল সায়া ইত্যাদি পরা ভালো মেয়ের লক্ষণ নয়। গর্ব এমন এক কর্ম যাতে মানুষ লোকচক্ষে খর্ব হয়ে যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যা ইচ্ছা খাও-পর, তবে যেন দু’টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও গর্ব।” *(বুখারী)*

আল্লাহ তাআলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। কিন্তু এতে সময় ও অর্থের অপচয় করা বৈধ নয়। কারণ, তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। পরন্তু অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই-বোন।

সবশেষে বলি যে, সকলের জন্য সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান অলঙ্কার হল, ঈমান, জ্ঞান ও আদবের অলঙ্কার। এ অলঙ্কার না থাকলে, অন্য কোন অলঙ্কারেই রমণী রমণীয় ও সুন্দরী হতে পারে না। মহিলা যদি তাকওয়ার লেবাস না পরে, তাহলে অন্য কোন লেবাস তার ইজ্জত ঢাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (الأعراف ٢٦)

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি

তোমাদেরকে লেবাস দিয়েছি। পরন্তু 'তাক্বওয়া'র লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, একজন মুসলিম নারীর উচিত হল, স্বামীর জন্য বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যের খেয়াল রাখার সাথে সাথে আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যের অধিক খেয়াল রাখা। যেহেতু কসমেটিক ও অলঙ্কার যেমন নারীর রূপ বর্ধন করে, তেমনি সুন্দর চরিত্রও রূপের ফুল-বাগানে বসন্ত আনে।

একজন এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল, এ বৃদ্ধ বয়সেও তোমার দেহ-মুখে লাবণ্য! তুমি কোন্ ক্রিম ব্যবহার কর? বৃদ্ধা বলল, দুই ঠোঁটে ব্যবহার করি সত্যবাদিতার লিপ্‌ষ্টিক, চোখে ব্যবহার করি (হারাম থেকে) অবনত দৃষ্টির কাজল, মুখমন্ডলে ব্যবহার করি পর্দার ক্রিম ও গোপনীয়তার পাওডার, হাতে ব্যবহার করি পরোপকারিতার ভেজলীন, দেহে ব্যবহার করি ইবাদতের তেল, অন্তরে ব্যবহার করি আল্লাহর প্রেম, মস্তিষ্কে ব্যবহার করি প্রজ্ঞা, আত্মায় ব্যবহার করি আনুগত্য এবং প্রবৃত্তির জন্য ব্যবহার করি ঈমান।

ময়ুরের মত সুন্দরী হয়েও তা নিয়ে গর্ব করা উচিত নয় মুসলিম নারীর। কারণ, ময়ুর নিজের পায়ের দিকে তাকালেই তার সে গর্ব খর্ব হয়ে যায়। চরিত্রে দোষ থাকলে সে নারীর রূপের কি দাম? ফুলের সুবাস না থাকলে, তার কি কোন কদর থাকে? খাবারে নুন না থাকলে যেমন তার প্রতি আগ্রহ থাকে না, তেমনি নারীর গুণ না থাকলে তার প্রতি আগ্রহ না থাকারই কথা।

পক্ষান্তরে ফুলের সৌরভ আর রূপের গৌরব থাকেও না বেশী দিন। আর মালার ফুল বাসি হলেই তার মর্যাদা কমে যায়। অতএব রূপ নিয়ে গর্ব কিসের?

পরন্তু হার্দিক রূপ থাকলে এবং বাহ্যিক রূপ তত না থাকলে মনঃক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয় কোন নারীর। যেহেতু চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ আছে, পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভোম্‌রা বসে থাকে।

প্রসাধিকা মহিলাকে জেনে রাখা উচিত যে, সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের পিছনে যে সময় নষ্ট হয় তা সামান্য নয়। প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা করে ধরলে ৬০ বছর বয়সে কমসে কম ১৮২৫০ ঘন্টা (প্রায় ২৫ মাস ১০দিন) তার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হয়। আর এই পরিমাণ সময় যদি ফালতু ব্যয় হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামতের মাঠে সময় নষ্ট করার প্রশ্নের জবাবে উত্তর তৈরী করে রাখা দরকার ঐ মহিলার।

আধুনিক জীবনের কিছু আদব

۞ টেলিফোন ঃ

টেলিফোন আমাদের আধুনিক জীবনে বড় উপকারী জিনিস। তবে এর অপকারিতার ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়। যেহেতু ঃ

۞ এর সাহায্যেই অন্তঃপুরবাসিনী অন্দর মহল হতেই প্রণয়ের বাঁশী বাজায়। এরই দ্বারা তরুণ-তরুণীরা আপোসে পরিচয়, প্রেমালাপন, সাক্ষাতের ওয়াদাদান, অভিরতি ও অভিসার প্রকাশ ইত্যাদি করে থাকে।

۞ অজ্ঞাত-পরিচয় খল ব্যক্তি ও শত্রুরা এরই মাধ্যমে দাম্পত্যে ও পরিবারে ভাঙ্গন ধরায়। চুগলখোর ও গীবতকারীরা হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্যবশে সোনার সংসারে আগুন লাগায়।

۞ অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় (অধিকাংশ মহিলাদের তরফ থেকে) দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথে আলাপে অনর্থক সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়।

অতএব আপনি সতর্ক হন এবং পরিবারকে ঈমানী তরবিয়ত দিয়ে এ যন্ত্রের মন্দ থেকে দূরে থাকুন।

۞ মোবাইল ঃ

দূরালাপের জন্য মোবাইল আমাদের জন্য আরো বেশী উপকারী যন্ত্র। কিন্তু তার অপকারিতাও টেলিফোনের চাইতে অনেক বেশী। আর ছেলে-মেয়েদের হাতে পড়লে তাতে আপনার সতর্কতার কিছুই নেই। আপনি কি তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবেন?

মোবাইলের মাধ্যমে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। খারাপ চিঠি থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

তাতে ব্যবস্থা আছে কথা রেকর্ড করার। সুতরাং জাসূসী করা থেকে দূরে থাকুন।

ক্যামেরাবিশিষ্ট মোবাইল হলে কারো অজান্তে তার ছবি তুলবেন না। কোন অবৈধ ছবি অবশ্যই তুলবেন না।

আর টেলিফোন বা মোবাইলের রিং সাধারণ রাখুন। অবশ্যই কোন প্রকার মিউজিক বা গান লাগিয়ে রাখবেন না। এ ছাড়া মসজিদে বা দর্সে গেলে রিং বন্ধ রাখুন। আপনার মোবাইল দ্বারা অপরকে কষ্ট দিবেন না বা নিজ তথা অপরের ইবাদতের মনোযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট করবেন না।

পরন্তু ইবাদতের জায়গায় যদি রিং বন্ধ করতে ভুলেই যান, তাহলে প্রথম রিং হওয়া মাত্র সাথে সাথে বন্ধ করে ফেলুন। নামায অবস্থায় হলেও তা ছেড়ে রাখবেন না। কারণ, তাতে আপনার সাথে প্রায় সকল নামাযীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

۞ রেডিও-টিভি, ভিডিও ঃ

রেডিও শুনুন, কিন্তু গান-বাজনা শোনা থেকে অবশ্যই দূরে থাকুন।

টিভি দেখুন, কিন্তু গান-বাজনা শুনবেন না। অবৈধ কিছু দেখবেন না। *(টিভির অপকারিতা সম্বন্ধে জানতে 'আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ' পড়ুন।)*

ভিডিও ক্যামেরা, ভিসিয়ার, ভিসিডি ইত্যাদি যন্ত্র খুব সাবধানে ব্যবহার করুন। এসব যন্ত্রকে দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করুন। তবে সাবধান থাকবেন, যাতে 'বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠব্যাধি' না হয়ে বসে।

۞ কম্পিউটার, ইন্টারনেট ঃ

আধুনিক যুগে কম্পিউটার একটি আশ্চর্য জিনিস। এটিকেও আপনি আপনার উপকারে ব্যবহার করুন। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করুন খুব সতর্কতার সাথে। যেহেতু তাতে মধুও আছে এবং বিষও।

۞ গাড়ি ঃ

গাড়ি চালালে অতি সাবধানতার সাথে চালান। ট্রাফিক আইন অবশ্যই মেনে চলুন। অপর সাইডে কোন গাড়ি থাক্ বা না-ই থাক্ আপনার শিগন্যাল গ্রীন না হলে আপনি তা অতিক্রম করবেন না। অবশ্য গ্রীন হলেও অন্য সাইড ভালোভাবে দেখেই পার হন, কারণ আইন ভঙ্গকারী মানুষের অভাব নেই।

মাত্রাধিক স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিজের তথা অপরের জীবনকে মরণের দিকে ঠেলে দিবেন না।

রোডে অপর গাড়ি বা পথচারীর খেয়াল অবশ্যই রাখবেন। পথের অধিকার সকলকেই যথোচিতভাবে প্রদান করবেন। উচিতভাবে সাইড দেবেন। খবরদার রোডে কারো সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আগে যেতে চেষ্টা করবেন না। আপনার গাড়ির হর্নে ঘুমন্ত, রোগগ্রস্ত বা ইবাদতরত কোন ব্যক্তির ডিস্টার্ব করবেন না। রাতে সামনে গাড়ি থাকলে হেড-লাইট জ্বালিয়ে রাখবেন না।

গাড়ি চালানো একটি নেহাতই টেনশনের কাজ। সুতরাং অপরের ভুলের সাথে আপনার প্রচুর ধৈর্যের দরকার।

একজন মুসলিম হবে এতই আদর্শবান যে, তার মাধ্যমে অন্য লোকে কোন প্রকার কষ্ট পাবে না।

মসজিদে যাওয়ার আদব

মসজিদে যাওয়া ও সেখানে অবস্থানের নানা ফযীলত ও আদব সম্পর্কে 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির'-এ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দলীল উল্লেখ না করে কেবল শিরোনামগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া উত্তম মনে করি।

১। মসজিদ যাওয়ার আগে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করুন। নিজ দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আর এমন কিছু ব্যবহার করবেন না, যাতে আপনার মুখ বা দেহ থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং তার ফলে কোন মুসল্লী ও আল্লাহর ফিরিশ্তা কষ্ট পান।

বলা বাহুল্য, কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে, ঘামে ভিজা পোশাক পরে, মাছ বা ভেঁড়ার মাঝে কাজ করে সেই লেবাস ও অবস্থায় মসজিদে আসা উচিত নয়। উচিত নয় (হারাম ও দুর্গন্ধময়) বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে আসা।

২। মসজিদে আসার আগে যথাসাধ্য সৌন্দর্য অবলম্বন করুন। বিশেষ করে জুমআহ ও ঈদের জন্য সুন্দর পোশাক পরিধান ও আতর ব্যবহার করুন।

৩। দুনিয়ার মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে মসজিদে আসুন যথাসাধ্য সকাল সকাল ও আগেভাগে। তবেই তো নফল নামায, কুরআন তিলাঅত ও যিক্‌র-আযকার বেশী বেশী করতে পারবেন। প্রথম কাতারে জায়গা নিতে পারবেন।

৪। মসজিদে যাওয়ার পথে বড় বিনয়-নম্রতা ও ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করুন। আপনার চলনে যেন কোন প্রকার অস্থিরতা, চাঞ্চল্য বা তাড়াহুড়া না থাকে। রাস্তা চলতে দৃষ্টিকে অবনত ও সংযত করুন।

৫। মসজিদের দিকে যেতে রাস্তায় যে দুআ পড়তে হয়, তা পড়ুন।

৬। মসজিদে যাওয়ার পথে নামাযের আগে দুই হাতের আঙ্গুলগুলির মাঝে খাঁজাখাঁজি করবেন না।

৭। মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে রেখে নির্দিষ্ট দরূদ ও দুআ পড়ুন।

৮। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়ুন। অবশ্য সময় না থাকলে কেবল সুনান রাতেবাহ পড়েও বসা যায়।

৯। পারলে মসজিদে বসে (যিকর ও তিলাঅতের সাথে) পরবর্তী নামাযের অপেক্ষা করুন। এর বড় ফযীলত রয়েছে। যিক্‌র ও ইল্‌মের মজলিসে বসে জান্নাতের ফল খান।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে 'তাসবীহ-তাহলীল' পড়ে জান্নাতের ফল খাওয়ার হাদীস

সহীহ নয়। *(যয়ীফুল জামে' ৭০১নং)*

১০। মসজিদে শয়ন করা বৈধ। অবশ্য শরমগাহ যাতে না খুলে যায়, তার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। শয়নের সময় কিবলার দিকে পা করতে হলে গোনাহ হবে না। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমাহ ৬/২৯২)* অবশ্য সামনেই কুরআন থাকলে সেদিকে পা করে বসা বা শোয়া যাবে না। আল্লাহর কালামের সাথে আদব বজায় রাখতে হবে।

১১। মসজিদে ঘুমানো বৈধ। বহু সাহাবী মসজিদে ঘুমিয়েছেন। *(বুখারী ৪৪০, ৪৪২নং)*

অবশ্য স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে সত্বর উঠে গিয়ে পবিত্র হতে হবে।

পক্ষান্তরে ঘরে জায়গা থাকতে মসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানানো উচিত নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।' *(সহীহ তিরমিযী ১/১০৩)*

১২। মসজিদে পানাহার করাও বৈধ। *(ইবনে মাজাহ ৩৩০০নং)* অবশ্য মসজিদ যাতে নোংরা না হয়ে যায়, তার খেয়াল জরুর রাখতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এ সময় থাকা-খাওয়া বৈধ করার জন্য ই'তিকাফের নিয়ত করাও বিধেয় নয়।

১৩। মসজিদে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজা বৈধ নয়। কাউকে কোন জিনিস মসজিদে ঘোষণা করে খুঁজতে দেখলে, তার জন্য বদ্দুআ দিয়ে বলা উচিত, আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন। *(মুসলিম ৫৬৮নং প্রমুখ)*

১৪। মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে তার জন্য বদ্দুআ দিয়ে বলা উচিত, আল্লাহ যেন তোমার ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত না দেন। *(তিরমিযী ১৩২১, দারেমী ১৪০১নং)*

১৫। মসজিদে গলা উঁচু করা, শোরগোল করা, জোরে জোরে কথা বলা বৈধ নয়।

১৬। মসজিদে নিছক সাংসারিক ও দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলবেন না। অবশ্য প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে দাওয়াতী প্রয়োজনে দুনিয়ার কথা বলা দোষাবহ নয়। কখনো কখনো সাহাবাগণ মসজিদের ভিতর জাহেলী যুগের কথা বলে হেসেছেন এবং নবী ﷺ ও মুচকি হেসেছেন। *(আহমাদ ২০৩৩৩, মুসলিম ২৩২২, নাসাঈ ১৩৫৮নং)*

১৭। মসজিদে বৈধ গজল ও কবিতা আবৃত্তি করায় দোষ নেই।

১৮। বিশেষ করে ঈদের দিন জিহাদের কাজে সহায়ক কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাও খেলা যায় মসজিদের সীমানায়। *(বুখারী ৪৫৫, মুসলিম ৮৯২নং)*

১৯। আযান হওয়ার পর একান্ত কোন প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না।

২০। মহিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে মসজিদে যেতে পারে। স্ত্রীকে মসজিদে যেতে স্বামীর বাধা দেওয়া উচিত নয়।

২১। মসজিদে যেতে চাইলে মহিলা যেন কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার না করে এবং

শরয়ী পর্দার সাথে ঘর থেকে বের হয়।

২২। মসজিদের পথে মহিলা যেন এমন চলন ও ভঙ্গিমা প্রদর্শন না করে অথবা তার চলনে যেন এমন কোন শব্দ না থাকে যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট হয়।

২৩। মহিলারা পুরুষদের পিছনে নামায পড়বে এবং নামায শেষে পুরুষদের বের হওয়ার আগে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে।

২৪। ঋতুমতী মহিলাদের জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়।

২৫। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে রেখে নির্দিষ্ট দরূদ ও দুআ পড়ুন।

কুরআনের প্রতি আদব

কুরআন মাজীদ মুসলিম জীবনের জীবন-সংবিধান। এতে রয়েছে পথহারা মানুষের জন্য পথের দিশা, ইহ-পরকালে সুখ ও সমৃদ্ধির পথের সন্ধান।

এই কুরআনের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে কতিপয় এই যে ঃ-

এই কুরআন হল, মহান আল্লাহর মজবুত রশি।

এই কুরআন হল, সকল কিছুর বিবরণী-গ্রন্থ।

এই কুরআন হল, যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টিকারী।

এই কুরআন হল, তার অনুসারীর গৌরববৃদ্ধিকারী এবং তার বিরোধীর গৌরব ক্ষুন্নকারী।

এই কুরআন হল, সর্ব যুগের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

এই কুরআন হল, অপরিবর্তিত ও অপরিবর্ধিত অবস্থায় কিয়ামত অবধি মানুষের পথপ্রদর্শক।

এই কুরআন হল, এমন গ্রন্থ; যার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন খোদ তার অবতীর্ণকারী মহান আল্লাহ।

এই কুরআন হল, বিজ্ঞানময়; যার সাথে সঠিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ নেই।

এই কুরআন হল, সমস্ত গ্রন্থের সর্দার, গ্রন্থসম্রাট।

এই কুরআন হল, এমন গ্রন্থ; যার সত্যতায় কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

এই কুরআন হল, মানুষের দৈহিক ও হার্দিক আধি ও ব্যাধির মহৌষধ।

এই কিতাবের দুটি আয়াত দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক

উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!” *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

নামাযের মধ্যে তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!” *(মুসলিম ৫৫২ নং)*

যখনই কোন জন-গোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর এই কিতাব তেলাঅত করে ও আপোসে অধ্যয়ন করে তখনই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন----। *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

এ কুরআন যে শিখে ও শিক্ষা দেয় সেই হল শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে।” *(বুখারী ৫০২৭ নং)*

এই কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফয্‌কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পূতচরিত্র লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয্ না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে ‘ওঁ-ওঁ’ করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(মুসলিম ৭৯৮ নং)*

মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহ্‌লে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।” *(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২১৬৫ নং)*

কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, হে প্রভু! কুরআন পাঠকারীকে অলংকৃত করুন।’ সুতরাং তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, ‘হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।’ সুতরাং তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, ‘হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, ‘তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।’ আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

কুরআন তেলাঅতকারীকে বলা হবে, ‘পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে-ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।’ *(আবু দাঊদ নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮১২২ নং)*

কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকে বলা হবে, ‘(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ

করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এই ভাবে সে তার (মুখস্ত করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।" *(আহমদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৮১২১ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

এ কিতাবের একটি হরফ পাঠ করলে পাওয়া যায় দশটি সওয়াব। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৬৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (অধিক) ভালবাসুক অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুন, সে যেন কুরআন দেখে পাঠ করে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৪২নং)*

এই মহাগ্রন্থ তেলাঅত ও অধ্যয়নের বিভিন্ন আদব রয়েছে। সেই সকল আদব মান্য করা মুসলিমের কর্তব্য।

১। কুরআন শিখা ও পড়ার সময় ইখলাস রাখুন।

যেহেতু কুরআন তেলাঅত একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক ইবাদত কবুল হয় দুটি শর্তে; ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদীর পথ অনুসরণ করে।

সুতরাং কুরআন শিক্ষা ও পাঠের সময় আপনার মনে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। নচেৎ তা শির্কে পরিণত হতে পারে, আর তার পরিণতি অবশ্যই ভালো নয়।

কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে তিন ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্‌ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখেছ; যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। *(মুসলিম ১৯০৫ নং, নাসাঈ)*

২। কুরআন শিক্ষা করে তার উপর আমল করুন।

যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদেরকে তা তেলাঅত করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তার উপর আমল করার জন্যই। সুতরাং কুরআন যাকে হালাল বলে তা হালাল, যাকে হারাম বলে তা হারাম বলে মেনে নিন। কুরআন যা করতে নিষেধ করে তা খবরদার করবেন না। যা করতে আদেশ করে তা অবশ্যই পালন করুন। কুরআনের স্পষ্ট-অস্পষ্ট সকল আয়াতের উপর যথার্থ ঈমান রাখুন। এই গ্রন্থে দেওয়া সমস্ত খবরকে সন্দেহহীন মনে বিশ্বাস করুন। দ্বিধাহীন চিত্তে এর ফায়সালা ঘাড় পেতে মেনে নিন। তবেই হবে যথাযথভাবে কুরআন তেলাঅত। আমল না করে কুরআন তেলাঅতের কি কোন লাভ থাকতে পারে?

যার কাছে কুরআনী ইল্ম আছে (আলেম, ক্বারী) অথচ তার প্রতি অবহেলা করে রাত্রে নিদ্রায় বিভোর থাকে এবং দিনে তার উপর আমল করে না তাকে (এবং যে ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাকে) বারযাখে (কবর-জগতে) চিৎ করে শায়িত করা হয়। তার শীর্ষদেশে দন্ডায়মান একজন (ফিরিশ্তা) তার মস্তকে (ছোট) পাথর ছুঁড়ে মারেন। তাতে তার মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং ছুঁড়া পাথরটি পুনরায় কুড়িয়ে এনে পুনরায় ছুঁড়ে মারার পূর্বেই তার মস্তক অক্ষত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর পুনঃ পুনঃ কিয়ামত অবধি এইভাবে তার আযাব হতে থাকে। *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

৩। কুরআন হিফ্য করুন এবং হিফ্য করার পর তা যেন ভুলে না যান।

কুরআন শিখার পর তা ভুলে যাবেন না। যে সূরা মুখস্থ আছে, তা যেন মুখস্থ থাকে সেই চেষ্টাই করবেন। মুখস্থ সূরা নামাযে পড়ুন, তাহলে অনুশীলনের ফলে তা মনে থাকবে। প্রত্যহ কিছু কিছু করে তেলাঅত করুন। নামাযের আযান হওয়া মাত্র মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে বসে না থেকে নিয়মিত কুরআন পাঠ করুন। প্রতীক্ষার দীর্ঘ সময়কে কুরআন পাঠ করে কাজে লাগান। গাড়িতে ও বাড়িতে কুরআনের ক্যাসেট শুনুন।

তা না করতে পারলে কুরআন মুখস্থ থাকবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা নিয়মিত কুরআন পাঠ কর। নচেৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! বাঁধা উঁট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" *(বুখারী ৫০৩৩নং, মুসলিম)*

তিনি বলেন, "কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উঁট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উঁট পালিয়ে যাবে।" *(বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, (পাঠ করার মাধ্যমে) তার যত্ন কর, তা ঘরে রাখ এবং সুরেলা কণ্ঠে তা তেলাঅত কর। কারণ, উঁট যেমন রশির বন্ধন থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" *(দারেমী, আহমাদ ৪/ ১৪৬, ১৫০, ১৫৩, ৩৯৭)*

সুতরাং বারবার যথা নিয়মে পুনরাবৃত্তি করলে তবেই কুরআন মনে থাকবে। নচেৎ অনায়াসেই তা মন থেকে মুছে যাবে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

৪। কুরআন ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' বলবেন না।

মুখস্থ কুরআন ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' বলা মকরূহ। কারণ তাতে গাফলতি ও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। বরং সেই সময় বলতে হয়, 'আমাকে কুরআন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।' মহানবী ﷺ বলেন, "কারো এ কথা বলা নিকৃষ্ট যে, 'আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি।' বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ৫০৩৯, মুসলিম ৭৯০নং)*

৫। হৃদয় ব্যস্ত না থাকলে কুরআন তেলাঅত করুন। অবসর সময়ে কুরআনে মন বসবে ভালো। অতএব রাতের তেলাঅত সবচেয়ে উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাত্রির জাগরণ (কুরআন) হৃদয়ঙ্গমের জন্য অধিক সহায়ক এবং সঠিক তেলাঅতের পক্ষে অধিক অনুকূল। অবশ্যই দিবাভাগে রয়েছে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। *(সূরা মুযযাম্মিল ৬-৭ আয়াত)*

বিশেষ করে ফজরের সময় কুরআন তেলাঅত বড় ফযীলতপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨ ﴾ (الإسراء ٧٨)

অর্থাৎ, ফজরের কুরআন (নামাযের সময় ফিরিশ্তা) উপস্থিত থাকে। *(সূরা ইসরা ৭৮)*

৬। আল্লাহর কালাম বুঝে পড়ুন।

টিয়া পাখীর মত কুরআন মুখস্থ বা দেখে পড়লে সওয়াব হতে পারে, তবে বিশেষ লাভ নেই। কারণ কুরআন বুঝা ও তা নিয়ে জ্ঞান-গবেষণা করা তথা তার উপর আমল করা ওয়াজেব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴾

অর্থাৎ, তারা কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না কেন? যদি ওটা আল্লাহ ছাড়া

অন্য কারো নিকট হতে হতো, তাহলে তারা ওতে বহু মতানৈক্য প্রাপ্ত হতো। *(সূরা নিসা ৮২ আয়াত)*

আসলে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা বুঝে তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝٢٩ ﴾ (ص ٢٩)

অর্থাৎ, এ এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ۝١٢١ ﴾ (البقرة ١٢١)

অর্থাৎ, আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তা যথার্থরূপে তেলাঅত করে। তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। *(সূরা বাকারাহ ১২১ আয়াত)*

আর যথার্থরূপে (তেলাঅতের হক আদায় করে) তেলাঅত তখনই হবে, যখন তা শুদ্ধভাবে ও বুঝে পড়ে আমল করা হবে।

তিনি নিজ বান্দার গুণ বর্ণনা করে বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ۝٧٣ ﴾

অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। *(সূরা ফুরকান ৭৩ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, যারা না বুঝে কুরআন পড়ে এবং কুরআনের উপর আমল করে না, তারাই তার প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে।

সলফে সালেহীনগণের অভ্যাস ছিল কুরআন বুঝে পড়ে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা। আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ইল্‌ম ও আমল শিক্ষা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা ইল্‌ম ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' *(আহমাদ ২২৯৭১নং)*

আল্লাহর কিতাব বুঝে পড়তে হয় বলেই তাড়াহুড়া করে তা খতম করা বিধেয় নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

৭। দাঁড়িয়ে থাকা ও চলা অবস্থায়, শুয়ে থাকা বা সওয়ারীতে সওয়ার অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ।

যেহেতু মহান আল্লাহ চিন্তাশীল বান্দাদের প্রশংসা করে বলেন, "তারা দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা এবং শুয়ে থাকা অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে---।" *(সূরা আলে ইমরান ১৯১ আয়াত)* সওয়ারীর পিঠে চড়ে আয়াত পড়ার নির্দেশ রয়েছে কুরআনে। *(সূরা যুখরুফ ১৩ আয়াত)* মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সওয়ারী উঁটের পিঠে চড়ে সূরা ফাত্হ পাঠ করেছেন। *(বুখারী ৫০৩৪, মুসলিম ৭৯৪নং)*

যেমন কোন অপবিত্র ব্যক্তির পাশে বসে, তার দেহে দেহ লাগিয়ে অথবা তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাঅত করা দোষাবহ নয়। কেননা, মহানবী ﷺ মা আয়েশার কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়েছেন। অথচ মা আয়েশা তখন মাসিক অবস্থায় থাকতেন। *(বুখারী ২৯৭, মুসলিম ৩০১নং)*

আর এখান থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, কোন অপবিত্র জায়গার ধারে-পাশে (আড়ালে) কুরআন পড়া যায়। *(ফাতহুল বারী ১/৪৭৯)*

৮। পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করুন।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ﴾ (الواقعة ٧٩)

অর্থাৎ, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। (অথবা যেন না করে।) *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৭৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আর পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" *(মালেক ৪৬৮, ইরওয়াউল গালীল ১২২নং)*

মুসআব বিন সা'দ বিন আবী অক্কাস বলেন, আমি সা'দ বিন আবী অক্কাসের জন্য মুসহাফ ধারণ করতাম। একদা আমি চুলকালাম। তা দেখে সা'দ বললেন, সম্ভবতঃ তুমি তোমার প্রস্রাব-দ্বার স্পর্শ করলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি ওঠো এবং ওযূ করে এসো। অতঃপর আমি উঠে ওযূ করে এলাম। *(মুঅত্ত্বা, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৬১)*

প্রকাশ থাকে যে, কাপড়, জুযদান, রেহেল বা ছোট বাক্সে কুরআন রেখে অপবিত্র ব্যক্তি সরাসরি হাত না লাগিয়ে তা বহন করতে পারে।

পক্ষান্তরে অপবিত্র অবস্থায় কুরআনের ক্যাসেট বা সিডি সরাসরি স্পর্শ করা দোষাবহ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১৪৩পৃঃ)*

যেমন (পবিত্র ব্যক্তির) পকেটে কুরআন রাখা বৈধ। অবশ্য তা পকেটে রেখে পেশাব-পায়খানা করা বা বাথরুম বা অপবিত্র জায়গায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে আল্লাহর কিতাবের সম্মান-হানি হয়। দরকার হলে কুরআন বাইরে কোন পবিত্র জায়গায় রেখে পেশাব-পায়খানা করতে হবে। অবশ্য চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় হলে নিরুপায় অবস্থায় সঙ্গে নিয়েই নাপাক জায়গায় প্রবেশ করা বৈধ হবে। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৪০)*

৯। পবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাঅত করুন।

যে নাপাকীতে গোসলের প্রয়োজন সে নাপাকী অবস্থায় কুরআন তেলাঅত (মুখস্থ পড়া অথবা কুরআন স্পর্শ না করে দূরে রেখে দেখে পড়া) বৈধ নয়। আলী ﷺ বলেন, 'বড় নাপাকীর অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।' *(আহমাদ ৬২৭, তিরমিযী ১৩১নং, আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ)*

অবশ্য যে নাপাকীতে গোসলের দরকার হয় না বরং কেবল ওযূর দরকার হয়, সে নাপাকী অবস্থায় কুরআন মুখস্থ পড়া যায়। যেহেতু মহানবী ﷺ একদা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে সূরা আলে ইমরানের শেষের ১০টি আয়াত পাঠ করার পর ওযূ করেছেন।

একদা উমার ﷺ এক সম্প্রদায়ের নিকট এলেন; তখন তারা কুরআন পড়ছিল। সেখান থেকে তিনি (পেশাব অথবা পায়খানার) প্রয়োজনে গেলেন এবং কুরআন পড়তে পড়তে ফিরে এলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! ওযূ না করেই আপনি কুরআন পাঠ করছেন?' তার এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমাকে এ ফতোয়া কে দিয়েছে (যে, বিনা ওযূতে কুরআন পড়া যাবে না)? (ঝুটা নবী) মুসাইলিমাহ নাকি?' *(মুঅত্তা ৪৬৯নং)*

অবশ্য ওযূ অবস্থাতেই কুরআন (মুখস্থ) পড়া উত্তম।

সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী কুরআন মুখস্থ অথবা দেখে পড়া যায়। তবে দেখে পড়া উত্তম, যেমন পূর্বে এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। অনুরূপ যার কুরআন আছে, সে হাফেয হলেও মাঝে মাঝে তা দেখে পড়া দরকার। যাতে তা একেবারে পরিত্যক্ত না হয়ে যায়।

১০। ঋতুমতী মহিলা মাসিক ও প্রসবোত্তর খুন জারি থাকাকালে (প্রয়োজনে) কুরআন মুখস্থ পড়তে পারে।

যেহেতু তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৭৪)*

১১। আল্লাহর বাণী তেলাঅতের পূর্বে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নেওয়া উত্তম।

আল্লাহর কালাম পাঠের জন্য এটি একটি আদব। যাতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাণীর সাথে আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত না হয়। মহানবী ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই সর্বাগ্রে দাঁতন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। *(বুখারী ১১৩৬, মুসলিম ২৫৫নং প্রমুখ)*

১২। কুরআন তেলাঅত শুরু করার পূর্বে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করুন।

কেননা শয়তান চায় না যে, আপনি আল্লাহর বাণী পাঠ করুন। পাঠ করলেও সে আপনার মনকে অন্য স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ফলে কুরআনে মনোযোগ থাকে না, অর্থ বুঝে পড়তে মন বসে না অথবা পড়তে ভুল হয়ে যায়। সেই জন্যই মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾ (النحل ٩٨)

অর্থাৎ, যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। *(সূরা নাহ্ল ৯৮ আয়াত)*

অতএব তেলাঅত শুরু করার পূর্বে বলুন, 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।'

অতঃপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে কুরআন পাঠ শুরু করুন। শুরু সূরা থেকে পড়তে আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ---' পড়ুন। অবশ্য মাঝ সূরা থেকে পড়তে আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ--' নাও বলতে পারেন।

১৩। সূরার প্রথম অংশ থেকে তেলাঅত শুরু করুন। সূরার মাঝখান থেকে শুরু করলে এমন আয়াত থেকে শুরু করুন, যে আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের অর্থের কোন সম্পর্ক নেই এবং এমন আয়াতে আপনার ক্বিরাআত শেষ করুন, যে আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। আর এ জন্যই যারা কুরআনের অর্থ বুঝেন না, তাঁদের জন্য আধা সূরা অপেক্ষা পূর্ণ সূরা পড়াই উত্তম। *(আযকার নওবী ১৬৩পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, বাক্যে যেখানে থামা চলে না, সেখানে থামলে অথবা যেখানে থামতে হয়, সেখানে থেমে গেলে অর্থ উল্টা হওয়া স্বাভাবিক। যেমন ধরুন, এক দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে জরিমানা লাগিবে।' কিন্তু আপনি যদি পড়েন, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে জরিমানা লাগিবে।' তাহলে নিশ্চয় আপনার বুঝের সাথে আমল এবং তার পরিণামও মন্দ হবে। সুতরাং থামার চিহ্ন চিনে কুরআন পড়ুন।

১৪। কুরআন পড়ুন ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।

কুরআন তেলাঅতে তাড়াহুড়া ঠিক নয়। বরং মহান আল্লাহর বাণী বড় আদবের সাথে একটা একটা গোটা গোটা স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, প্রত্যেক অক্ষরকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে, যেখানে টানতে হয় সেখানে টেনে এবং যেখানে টানতে হয় না সেখানে না টেনে পাঠ করুন।

মহান আল্লাহ অনুরূপভাবে কুরআন পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ۝٤ ﴾ (المزمل ٤)

অর্থাৎ, ---তুমি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন আবৃত্তি কর। *(সূরা মুয্যাম্মিল ৪ আয়াত)*

তাড়াতাড়ি কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার ফলে অর্থ উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা ইত্যাদি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সুতরাং বেশী সওয়াব লাভের আশায় অল্প সময়ে তাড়াহুড়া করে বেশী বেশী করে আয়াত পাঠ করার চাইতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে অল্প করে পড়াতেই বেশী উপকার ও সওয়াব আছে।

একজন কুরআনের মানে জানে ও তা বুঝে পড়ে, দ্বিতীয়জন মানে জানে কিন্তু না বুঝে পড়ে এবং তৃতীয়জন মানেই জানে না - এই তিনজনের পড়া এবং তাদের সওয়াব অবশ্যই সমান নয়।

মহানবী ﷺ আল্লাহর আদেশ অনুসারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতেন; তাড়াহুড়ো করে শীঘ্রতার সাথে নয়। বরং এক একটা হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন। *(ইবনুল মুবারক, যুহদ, আদাঃ, আঃ সিসানঃ ১২৪পৃঃ)*

তিনি বলতেন, "কুরআন তেলাঅতকারীকে পরকালে বলা হবে, 'পড়তে থাক এবং মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে ধীরে, শুদ্ধভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর, যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে। যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৮১২২ নং)*

তিনি বলতেন, "সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্স্বাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা

তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ৮২২নং)*

একদা আবূ জামরাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বললেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি কুরআন পড়তে পারি। আমি তিন দিনে তা খতম করি। ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি যা বলছ তার থেকে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমি এক রাতে সূরা বাকারাহ পড়ব এবং তার অর্থ বুঝে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করব। *(ফাযায়েলুল কুরআন, ইবনে কাষীর ২৩৬পৃঃ, কিতাবুল আদাব ২৩পৃঃ)*

শুদ্ধভাবে তাড়াতাড়ি পড়ায় দোষ নেই। তবুও ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে পড়াই উত্তম। আসলে যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে অনেক আয়াত পাঠ করে, সে ব্যক্তি হল তার মত যে ছোট ছোট অনেক মোতি বা অলঙ্কার দান করে। আর যে ব্যক্তি সুন্দর করে ধীরে ধীরে অল্প আয়াত পাঠ করে, সে ব্যক্তি হল তার মত যে বড় আকারের সমমূল্যের অথবা অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের একটি মাত্র মোতি বা অলঙ্কার দান করে। অবশ্য এর বিপরীতও হতে পারে। *(ফাতহুল বারী ৮/৭০৭)*

১৫। কুরআনে যেখানে যেমন টান আছে, ঠিক তেমন টান দিয়ে পড়ুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হরফে-মাদ্দ্' (আলিফ, ওয়াউ ও ইয়া)কে টেনে পড়তেন। *(বুখারী ৫০৪৫, আবূ দাঊদ ১৪৬৫ নং)* কখনো কখনো বিনম্র সুরে 'আ-আ-আ' শব্দে অনুরণিত কণ্ঠে কুরআন তেলাঅত করতেন। *(বুখারী ৭৫৪০, মুসলিম)*

বলাই বাহুল্য যে, বাংলা অক্ষরে লিখিত কুরআন পাঠ করতে গিয়ে উচ্চারণ সঠিক হয় না। যথাস্থানে টান দেওয়া ও না দেওয়ার ব্যাপারও কঠিন। অতএব যাঁরা আরবী জানেন না, তাঁদের পক্ষে বাংলায় কুরআন পাঠে লাভের চাইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য ক্বারীর মুখ থেকে শুনে শুনে যা সঠিক ও শুদ্ধভাবে পড়া যায়, তাতে অবশ্যই লাভ আছে।

১৬। খুব মিষ্টি ও মধুর সুরে বিনয়-নম্রতার সাথে কুরআন পাঠ করুন।

আল্লাহর নবী ﷺ কুরআন মধুর সুরে পাঠ করতে আদেশ করতেন; বলতেন ঃ-

"তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কারণ, মধুর শব্দ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।" *(বুখারী তা'লীক, আবূ দাঊদ ১৪৬৮-নং, দারেমী, হাকেম)*

"কুরআন পাঠে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আওয়াজ তার, যার কুরআন পাঠ করা শুনে মনে হয়, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।" *(যুহ্দ, ইবনুল মুবারক, দারেমী, ত্বাবারানী, প্রমুখ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৫ পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়ে না।" *(আবূ দাঊদ ১৪৭১, ১৪৭৯নং, হাকেম)*

অবশ্য গানের মত অতিরঞ্জিতভাবে টান দিয়ে কুরআন পড়া বিদআত। *(কিতাবুল আদাব ২৬পৃঃ)*

১৭। কুরআন তেলাঅতের সময় কান্না।

ইমাম নওবী বলেন, কুরআন তেলাঅতের সময় কান্না করা 'আরেফীন' (আল্লাহ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী) মানুষদের গুণ এবং নেক লোকদের প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ ﴾ (الإسراء ١٠٧-١٠٩)

অর্থাৎ, এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের প্রতিপালকই পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদায়) পড়ে এবং তাদের তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। *(সূরা ইসরা ১০৭-১০৯)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ ﴾ (مريم ٥٨)

অর্থাৎ, এরাই আদম-বংশের অন্তর্গত নবীগণ; যাদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে কিশ্তীতে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল-বংশের অন্তর্গত এবং যাদেরকে আমি সুপথগামী ও মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট পরম দয়াময়ের আয়াত পাঠ করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পতিত হত। *(সূরা মারয়্যাম ৫৮ আয়াত)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কুরআন শুনাব অথচ তা আপনার উপরেই অবতীর্ণ হয়েছে?!' তিনি বললেন, "আমি অপরের নিকট তা শুনতে পছন্দ করি।" ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, অতএব আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। অতঃপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম,

((فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْداً))

অর্থাৎ, অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে আনয়ন করব। *(সূরা নিসা ৪১ আয়াত)*

তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট।" আমি তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দুটি থেকে অশ্রু ঝরছে। *(বুখারী ৪৭৬৮, মুসলিম ৮০০নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

((أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ))

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ? হাসছ এবং কান্না করছ না?! *(সূরা নাজ্‌ম ৫৯-৬০)*

তখন আহলুস সুফ্‌ফার [৩] সকলে 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন' বলে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের চোখের পানি গাল বেয়ে বইতে লাগল। তাঁদের কান্নার শব্দ শুনে মহানবী ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও লাগলাম কাঁদতে। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" *(তাফসীর কুরতুবী ৯/৮০)*

একদা ইবনে উমার ﷺ সূরা মুত্বাফফিফীন পাঠ করলেন। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন ঃ

((يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ))

(অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে।) তখন কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর অবশিষ্ট সূরা পড়া হতে বিরত থাকলেন। *(কাইফা নাঈশু রামাযান ১৯পৃঃ দ্রঃ)*

আপনিও কাঁদতে পারেন। আর তা ভালো লোকেরই আলামত। তবে লোকপ্রদর্শন থেকে দূরে থাকুন। ভেকের কান্না কাঁদা হতে বিরত থাকুন। যেহেতু তাতে লাভের জায়গায় ক্ষতিই পাবেন।

১৮। যে খুব সুন্দর কুরআন পড়তে পারে, তার নিকট থেকে কুরআন শুনতে চাওয়া মুস্তাহাব। একদা আল্লাহর নবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের নিকট থেকে কুরআন শুনতে চাইলেন। ইবনে মাসঊদ ﷺ বললেন, 'আমি আপনার নিকট কুরআন পড়ব,

---

([৩]) *তাঁরা ছিলেন কিছু নিঃস্ব (মুহাজেরীন) সাহাবী, যাঁদের থাকার মত কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তাঁরা মসজিদে নববীর সামনের সুফ্‌ফায় (দোচালায়) খেয়ে-না খেয়ে বাস করতেন এবং মহানবীর কাছে ইল্‌ম শিক্ষা করতেন।*

অথচ কুরআন আপনার উপর নাযিল হয়েছে?’ তিনি বললেন, “আমি তা অপরের নিকট থেকে শুনতে ভালোবাসি।” *(বুখারী ৫০৫৬নং)*

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুরআন পড়া ভাল, নাকি শোনা ভাল? আসলে উত্তম হল তাই করা, যা মনোযোগের জন্য এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার ব্যাপারে বেশী উত্তম। কারণ, তেলাঅতের উদ্দেশ্য হল, আয়াতের অর্থ অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম ও মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল। *(সালাতুল-লাইলি অত্‌-তারাবীহ, ইবনে বায ৪৬পৃঃ)*

১৯। একাকী থাকলে বা লোক দেখানির ভয় না থাকলে কুরআন সশব্দে পড়ুন। কুরআনের সাথে আপনার কণ্ঠের সুন্দর আওয়াজ লাগিয়ে নিজের মনকে মোহিত করুন। আর মুগ্ধ হন তার অর্থ জেনে। আবেগ এসে এসে আপ্লুত করুক আপনার হৃদয়-মনকে।

অবশ্য পাশে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকলে অথবা লোক প্রদর্শনের আশঙ্কা হলে অথবা আপনার শব্দ-মাধুর্যে কারো ফিতনায় পড়ার ভয় থাকলে কুরআন আস্তে পড়ুন। মহানবী ﷺ বলেন, “সশব্দে কুরআন তেলাঅতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মত এবং নিঃশব্দে তেলাঅতকারী গোপনে দানকারীর মত।” *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ জামে’ ৩১৫০নং)*

যেমন মসজিদে কুরআন তেলাঅত করলে এমন উচ্চস্বরে করবেন না, যাতে নামাযী অথবা অন্য তেলাঅতকারীদের ডিষ্টার্ব হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, “অবশ্যই নামাযী তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ আবূ দাঊদ ১২০৩নং, সহীহুল জামে’ ১৯৫১নং)*

পক্ষান্তরে কুরআন আস্তে পড়া বলতে মনে মনে পড়া নয়। বরং সওয়াব লাভের শর্ত হল, কুরআনের শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে। অতএব নিম্ন ও গুনগুন স্বরে কুরআন তেলাঅত করুন। যাতে উভয় দিক বজায় রাখতে পারেন। যেহেতু কুরআন দেখে মনে মনে পড়লে তেলাঅতের সওয়াব লাভ হবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৫১/১৪০)*

কিন্তু মহিলা হলে নিজের স্বামী ও মাহরাম আত্মীয়র সামনে বা তাকে শুনিয়ে সশব্দে ও মিষ্টি সুরে কুরআন তেলাঅত করতে পারে। নচেৎ গায়র মাহরাম (যার সাথে কোন কালেও বিবাহ বৈধ এমন) আত্মীয় বা অন্য কারোর সামনে বা তাকে শুনিয়ে এমন তেলাঅত করতে পারে না। মহিলার কণ্ঠস্বর ফিতনার জিনিস। আর ফিতনার ছিদ্রপথ বন্ধ করা অবশ্যই জরুরী। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/১২৭)*

২০। কুরআন পড়তে পড়তে তন্দ্রা বা ঢুল এলে পড়া বন্ধ করুন। যেহেতু সাধারণতঃ সে সময় আপনি কি পড়তে কি পড়ে বসে থাকবেন, তা হয়তো নিজেই বুঝতে পারবেন না।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে পড়তে ঢুলতে শুরু করে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে; যাতে তার ঘুম দূর হয়ে যায়। নচেৎ, কেউ ঢুলতে ঢুলতে নামায পড়লে সে হয়তো বুঝতে পারবে না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। *(বুখারী, মুসলিম ৭৮৬, মিশকাত ১২৪৫নং)*

তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে উঠে তার জিভে কুরআন পড়া জড়িয়ে গেলে এবং সে কি বলছে তা বুঝতে না পারলে, সে যেন শুয়ে পড়ে।" *(মুসলিম ৭৮৭নং)*

অতএব কুরআন তেলাঅত করতে করতে যখনই ঘন ঘন হাই আসতে শুরু করবে তখনই কুরআন পড়া বন্ধ করে দিন। নচেৎ তন্দ্রা তাড়াবার ব্যবস্থা করুন।

২১। কুরআন পড়তে পড়তে তস্‌বীহর কথা এলে তসবীহ পড়া এবং আযাবের কথা এলে আযাব থেকে পানাহ ও রহমতের কথা এলে রহমত চেয়ে প্রার্থনা করা সুন্নত। আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপই করতেন। *(মুসলিম ৭২৭নং)*

২২। সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা করা সুন্নত। ভক্তির এই সিজদায় সুন্নতী দুআ পড়ুন ঃ

ক- **سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقُوَّته.**

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্ক্বা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৪৭৪নং, আহমদ ৬/৩০)*

খ- **اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَّضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْراً، وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْراً، وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُوْدَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অয়া' আন্নী বিহা বিযরা, অজ্‌আলহা লী ইন্দাকা যুখরা, অতাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদার) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট

হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে গ্রহণ করেছ। *(সহীহ তিরমিযী ৮৭নং, হাকেম ১/২১৯, ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং)*

তেলাঅতের সিজদায় গিয়ে প্রথমে সিজদার দুআ পাঠ করে অতঃপর তেলাঅতের সিজদার দুআ পাঠ করুন। *(তাসহীহুদ দুআ, বাক্‌র আবূ যায়দ ২৯৩পৃঃ)*

মনোযোগ সহকারে ধ্যান দিয়ে যে ক্বারীর কুরআন শোনে তার জন্যও তেলাঅতের সিজদা সুন্নত। অবশ্য ক্বিরাআত চলা অবস্থায় ব্যস্ত থাকলে অথবা সেদিকে পার হতে গিয়ে ক্বিরাআতের শব্দে তেলাঅতের আয়াত কানে পড়লে সিজদা করতে হবে না। *(মুমতে' ৪/১৩৩)*

তিলাঅতের সিজদার জন্য ওযূ শর্ত নয়। শরমগাহ ঢাকা থাকলে কেবলামুখে এই সিজদাহ করা যায়। যেহেতু ওযূ শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। *(নাইলুল আউত্বার, মুমতে' ৪/১২৬, ফিকহুস সুন্নাহ আরবী ১/১৯৬)*

নামাযের ভিতর ঐ সিজদার আদব জানতে 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির' দেখুন।

২৩। মাঝে মাঝে কুরআন খতম করার চেষ্টা করুন। আপনার সময় ও সামর্থ্য অনুযায়ী মাসে এক থেকে দশবার কুরআন খতম করুন। তিন দিনের কম সময়ে খতম করার চেষ্টা করবেন না। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন খতম করার পর ফিরিয়ে সূরা ফাতিহা ও বাকারার পাঁচটি আয়াত পড়া বিদআত। *(বিদাউল কুর্রা' ২৬পৃঃ)*

২৪। (নামাযের বাইরে সাধারণ সময়ে) কুরআন খতমের পর দুআ করতে পারেন। সাহাবী আনাস ﷛ কুরআন খতম করার পর নিজ পরিবারের সকলকে ডেকে দুআ করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ, দারেমী, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/১৭২)*

তবে খতমের পর নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। অনেক কুরআনের শেষে 'দুআয়ে খতমুল কুরআন' শিরোনামে যে লম্বা দুআ লিখা থাকে, তা কারো মনগড়া দুআ। তদনুরূপ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার প্রতি যে 'দুআউ খাতমিল কুরআন' সম্বদ্ধ করা হয়, তাও সঠিক নয়। বিধেয় নয় তারাবীহর নামাযে খাতমে কুরআনের দুআ করা। *(আল-আজযাউল হাদীসিয়্যাহ, বাক্‌র আবু যায়দ ২৯০পৃঃ)*

তেলাঅত শেষে কোন যিক্‌রও নেই। ক্বারীদের 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' পড়া বিদআত। মহানবী ﷺ কত কুরআন পড়েছেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও প্রমাণ নেই যে, তিনি পড়ার শেষে ঐ দুআ পড়েছেন। তিনি অপরের নিকট থেকে কুরআন শুনেছেনও। কিন্তু তখনও তিনি ঐ দুআ বলেননি এবং বলতে আদেশ করেননি। বরং

বলেছেন, “বাস্ থামো।” *(বুখারী ৫০৫৫, মুসলিম ৮০০নং দ্রঃ)*

২৫। কুরআন তেলাঅতের আগে অথবা পরে কুরআন তুলে চুম্বন করা, চোখে বুলানো অথবা কপালে লাগিয়ে সিজদা করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহর কালামের প্রতি ভক্তি ও তা’যীম প্রদর্শন এক প্রকার ইবাদত। আর ইবাদতের ঐ পদ্ধতি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অতএব তা বিদআত হতে পারে।

সঊদী আরবের উলামা কমিটি এক বাক্যে বলেন, ‘কুরআন কারীম চুম্বন বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল আমাদের জানা নেই। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তেলাঅত করার জন্য, তা বুঝার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য।’ *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/ ১২২)*

২৬। কুরআন মাজীদের আয়াতকে নকশা বানিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো বিধেয় নয়। অনেকে তা তাবার্রুক গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে ঘরের দেওয়ালে লটকিয়ে থাকে। কেউ বা নিজের দোকানে খদ্দের বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বাঁধিয়ে রাখে, কেউ বাড়ির সদর দরজায় অথবা বিল্ডিং-এর সম্মুখভাগে আয়াত খোদাই করে রাখে। কেউ বা নিজ গাড়িতে তাবার্রুক গ্রহণ অথবা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন বা তার কোন অংশ রেখে থাকে। এ সকল কাজের কিন্তু শরীয়তে কোন সমর্থন মিলে না। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৩০-৩৩)*

২৭। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে জীবিত ব্যক্তির জন্য, মৃতব্যক্তি কুরআন দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হতে পারে না। অতএব মৃতব্যক্তির পাশে কুরআন পড়ে, তার নামে কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, কুলখানী বা শবীনাপাঠ করে কোন লাভ নেই। লাভ নেই কবরের পাশে কুরআনখানী করে; বরং তা বৈধই নয়।

শোকপালনের সময় কুরআন দিয়ে মজলিস মাতোয়ারা করা অথবা রেডিও-টিভিতে কুরআন পড়তে থাকাও শরীয়ত-সমর্থিত কর্ম নয়।

২৮। কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয লিখা বৈধ নয়। বৈধ নয় কুরআনের আয়াতকে কোন প্রকার অসম্মান ও অপবিত্রতার স্থানে পতিত করা।

আল্লাহর বান্দা! কুরআন শিক্ষা করুন। কুরআন বুঝে কুরআন তেলাঅত করুন। তার উপর আমল করুন। কুরআনের তা’যীম ও সম্মান করুন এবং কুরআনকে সর্বপ্রকার অসম্মান ও অপবিত্রতার হাত হতে রক্ষা করুন। আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন। আমীন।

বলাই বাহুল্য যে, কুরআনকে কেবল সুন্দর বাক্স বা জুজদানে ভরে তাকে তুলে রেখে

তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথেষ্ট নয়। আসলে কুরআনের কথা না মানলে সেটাই হয় তার প্রতি বড় অসম্মান প্রদর্শন। স্ত্রী তার স্বামীর যতই প্রশংসা করুক না কেন, যতই সম্মান প্রদর্শন করুক না কেন, সে সম্মানের আতিশয্যে যদি স্বামীর নাম মুখেও না নেয়, কিন্তু স্বামীর কথা না শোনে ও না মানে, তাহলে সে স্ত্রী নিশ্চয়ই প্রেম ও পুণ্যময়ী স্ত্রী নয়।

অতএব আপনার-আমার কর্তব্য কুরআনের যথার্থ কদর ও সম্মান করা, বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন ফলপ্রসূ নয়।

২৯। কুরআন জীর্ণ-শীর্ণ বা নষ্ট হয়ে গেলে, কুরআন থেকে পাতা বিচ্ছিন্ন হলে তা পানিতে ফেলবেন না। কারণ, পানির সাথে ময়লাও ভাসে অথবা ভাসিয়ে নিয়ে নোংরা জায়গায় ফেলতে পারে। সুতরাং তা পবিত্র মাটির নিচে দাফন করে ফেলুন, নতুবা ভালো করে পুড়িয়ে তার ছাই মাটিতে পুঁতে ফেলুন। কুরআনের পাতা বা তার টুকরো কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখলে তা তুলে নিয়ে ঐ কাজ করুন।

কুরআন পড়ার সময় মুখের লালা আঙ্গুলে লাগিয়ে পাতা উল্টাবেন না। কারণ, তাতে আপনার মুখের লালা কুরআনের পাতায় লেগে যায়; যা কুরআনের প্রতি অসম্মানসূচক।

৩০। কুরআন তেলাঅত শোনার সময় অন্য কাজ বা কথায় ব্যস্ত না থেকে চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে শুনুন। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ হয়। *(সূরা আ'রাফ ২০৪ আয়াত)*

৩১। কুরআন বা তার অর্থ নিয়ে কারো সাথে মতভেদ দেখা দিলে খবরদার তার সাথে তর্ক বা ঝগড়া করবেন না। কারণ, "কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা এক প্রকার কুফরী।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৩১০৬নং)*

অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য নিম্নে কতিপয় ক্বিরাআতের বিদআত উল্লেখ করা গেলঃ-

(১) কানে আঙ্গুল দিয়ে উচ্চশব্দে গলার রগ ফুলিয়ে ক্বিরাআত করা। অবশ্য কানে আঙ্গুল দিয়ে মিষ্টি সুরে ক্বিরাআত পড়াও বিদআত।

(২) খুব তাড়াতাড়ি হরফ ও হরকত চুরি করে ক্বিরাআত করা। এ ধরনের ক্বিরাআত সাধারণতঃ খতম বা শবীনা পাঠে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম এবং শবীনা পাঠও বিদআত।

(৩) একই জামাআতে ভাগাভাগি করে পারা নিয়ে কুরআন খতম করা।

(৪) বিরল (শায) কিরাআত দ্বারা কুরআন তেলাঅত করা।

(৫) নামাযে বা মহফিলে একাধিক কিরাআত দিয়ে কুরআন পড়া।

(৬) নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়ে মুনাজাত করা। যেমন প্রত্যহ ফজর নামাযের পর সূরা ইয়াসীন পড়ে মুনাজাত করা।

(৭) মুর্দা বা জানাযার সামনে কুরআন পড়া।

(৮) কবরের পাশে কুরআন পড়া।

(৯) কুরআন পাঠ করে ভিক্ষা করা।

(১০) সূরা যুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তকবীর পাঠ করা।

(১১) ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টার্জিত শব্দে কোন কারীর সুরের অনুকরণ করে কুরআন পড়া।

(১২) কুরআন পড়ার সময় দোলা বা দুলে দুলে কুরআন পড়া। এটি আসলে ইয়াহুদীদের অভ্যাস।

চলন ও আরোহণের আদব

আল্লাহর যমীনের বুকে চলাফেরার এবং তাঁর সৃষ্টি সওয়ারী ও যানবাহনের উপর চড়ার কিছু আদব রয়েছে ইসলামে। সেই আদব মেনে নিলে মানুষ ভদ্র ও সুশীল বলে পরিচিতি লাভ করে। ভালো হয় আল্লাহর কাছেও।

১। যমীনে চলাফেরা করার সময় অহংকার প্রদর্শন করা, নিজেকে হিরো ও অপরকে জিরো এবং গুরুকে গরু মনে করে অবজ্ঞার সাথে বিচরণ করা অভদ্র, অসভ্য ও গোঁয়ার লোকের নিদর্শন। আসলে একজন মুসলিম হয় ভদ্র ও বিনয়ী। মহান আল্লাহ তার চলার গুণ বর্ণনা করে বলেন,

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ﴾

অর্থাৎ, আর তারা রহমানের বান্দা, যারা যমীনের বুকে নম্রভাবে চলা-ফিরা করে এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদেরকে সম্বোধন করলে (উপেক্ষা করে) বলে, সালাম। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

পক্ষান্তরে অহংকারীরা ঔদ্ধত্যের সাথে রাস্তা চলে, হাসিমুখে কথা বলে না, গোমটা মুখ প্রদর্শন করে, পথে কাউকে সালাম দিতে চায় না এবং সালামের উত্তর দিতেও আগ্রহ দেখায় না।

মহান আল্লাহ লুকমান হাকীমের উপদেশ উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (সংযতভাবে) মধ্যরূপ পদক্ষেপ কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। *(সূরা লুকমান ১৯ আয়াত)*

﴿ وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকায়ো না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা লুক্বমান ১৮ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।” *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।” *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/১৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭নং)*

বহু মানুষ আছে যারা অহংকারের সাথে নিজ লুঙ্গি, পায়জামা বা প্যান্ট্ গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে রাস্তায় ছেঁচ্ড়ে নিয়ে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।” *(বুখারী ৫৭৮৪নং, মুসলিম ২০৮৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, “গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।” *(মুসলিম ২৬২০নং)*

সুতরাং চলনে অহংকার প্রদর্শন করার পরিণাম অবশ্যই ভালো নয়।

২। এমনভাবে পথ চলুন, যাতে শীঘ্রতা থাকবে; কিন্তু আপনার গাম্ভির্যও নষ্ট হবে না। আমাদের প্রিয়তম নবী ﷺ যখন পথ চলতেন, তখন শীঘ্র পদক্ষেপে চলতেন এবং তাঁর দেহের উপরিভাগ সামনের দিকে ঝুঁকে যেত। দেখে মনে হত, তিনি যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে ঢালু পথে নামছেন। *(মুসলিম ২৩৩০, আবূ দাউদ ৪৮৬৪, তিরমিযী ৩৬৩৮নং)*

বলা বাহুল্য, তাঁর চলন ছিল সুপুরুষ সুউচ্চ মনোবলবিশিষ্ট একজন বীরের মত। তাঁর চলনে দুর্বলতা ছিল না, ছিল না কোন প্রকার দাম্ভিকতা।

সুতরাং একজন মুসলিমের সেই ধরনের সভ্য চলন হওয়া প্রয়োজন, যে চলনে তরুণীর মত চাপল্য থাকবে না, হরিণের মত চাঞ্চল্য থাকবে না এবং থাকবে না দীন-হীন-ক্ষীণের মত দৌর্বল্য।

৩। কখনো কখনো খালি পায়ে চলা উত্তম।

ফুযালা বিন উবাইদ বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলতে আদেশ করতেন। *(আহমাদ ২৩৪৪৯, আবূ দাউদ ৪১৬০নং)*

মাঝে-মধ্যে বিশেষ করে সবুজ ঘাসের উপর খালি পায়ে চলার উপকারিতার কথা আজ বিজ্ঞানও শিকার করে। তাছাড়া সর্বদা জুতা পড়ে থেকে মানুষের মাঝে যে একটা

বিলাসিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা মাঝে-মধ্যে খালি পায়ে চলে দূর করা যায় এবং তাতে মনের মাঝে বিনয়ভাব সৃষ্টি করে।

৪। গাড়ি চড়ে কোথাও যাওয়ার সময় গাড়ি চড়ার দুআ পড়ুন। পথের মধ্যে অপর গাড়ির সুবিধার কথা খেয়াল রাখুন। আপনার গাড়ি দ্বারা যেন অন্য কোন মুসলিম কষ্ট না পায়। পথের মধ্যে কোন লোককে যদি আপনি তুলে নিয়ে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেন, তাহলে আপনার সদকাহ করার সমান সওয়াব লাভ হবে।

সফরের আদব

নিজ ঘর-বাড়ি ছেড়ে লেখাপড়া, ব্যবসা, জিহাদ, হজ্জ-উমরাহ অথবা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিদেশে সফর করা সহজ জিনিস নয়। সফর বড় কষ্টের, বড় ধৈর্যের। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সফর হল আযাবের একটি টুকরা। সফর তোমাদেরকে (নিয়মিত) পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং নিজ প্রয়োজন শেষ হলেই পরিবারের প্রতি সত্বর প্রত্যাবর্তন কর।" *(বুখারী ১৮০৪, মুসলিম ১৯২৭নং প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ নিজ জীবনে বহু সফর করেছেন। সুতরাং সফরের আদবেও তিনিই আমাদের আদর্শ। আসুন আমরা সেই আদব জেনে আমল করি।

১। দূরের সফরে একা যাওয়া উচিত নয়। কথায় বলে 'একা না বোকা।' বিপদে-আপদে একজন সহযোগী সঙ্গী হলে সফর অনেক সহজ হয়।

এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে কে ছিল?" লোকটি বলল, 'কেউ ছিল না।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একাকী সফরকারী শয়তান, দু'জন মিলে সফরকারীও দু'টি শয়তান। আর তিনজন মিলে সফরকারী হল (শয়তান মুক্ত) সফরকারী।" *(আহমদ, আবূ দাউদ ২৬০৭নং, তিরমিযী, হাকেম ২/১০২, সহীহুল জামে' ৩৫২৪নং)*

শয়তান মুমিনকে একা-দোকা পেয়ে কষ্ট দিতে ভারী সুযোগ ও অত্যন্ত মজা পায়। তাই একলা বা দোকলা সফরকারীকে শয়তান বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, জামাআতবদ্ধভাবে সফর করলে বিপদ-আপদে সহায়তা লাভ হয় এবং লাঘব হয় সফরের কষ্ট।

মহানবী ﷺ বলেন, "একাকীত্বে কত কষ্ট তা যদি মানুষ যদি জানত, যেমন আমি জানি, তাহলে রাতে কোন সওয়ারী একাকী পথ চলত না।" *(বুখারী ২৯৯৮-নং প্রমুখ)*

২। সফরে হলেও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে মুসলিমকে। জামাআত ও একতাবদ্ধ হয়ে সফর করতে হবে। আর এ জন্য একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তিনজন লোক কোন সফরে বের হয়, তখন তারা যেন তাদের মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।" *(আবূ দাঊদ ২৬০৮নং)*

৩। মহিলা হলে দূর সফরে একাকিনী যেতে পারে না। যেহেতু নারীর দুশমন সে নিজেই। তার যৌবন তার শত্রু ডেকে আনে। তাই একা সফরে তার বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী। আর সে জন্যই সঙ্গে স্বামী অথবা কোন এগানা আত্মীয় ছাড়া সফরে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

মহানবী ﷺ বলেন, "মাহরাম ছাড়া কোন মহিলা যেন একাকিনী সফর না করে।" *(বুখারী ১৭৬৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন কোন মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, সে তার পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই অথবা কোন এগানা পুরুষ ছাড়া তিনদিন বা তার বেশী পথ সফর করে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ১৭২৬, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৬৫০নং)*

এমনকি ইবাদতের সফর, হজ্জ ও উমরার সফর, জিহাদ বা দাওয়াত ও তবলীগের সফরেও একাকিনী কোন এগানা পুরুষ অথবা স্বামী ছাড়া যেতে পারে না।

এমনকি প্লেনে এক-আধ ঘন্টার সফর হলেও না। কারণ, এয়ারপোর্টে একাকিনী ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তাকে কত পুরুষের সম্মুখীন হতে হয়। চেহারা খুলে দেখাতে হয়। তাছাড়া পথিমধ্যে যদি প্লেন গন্তব্যস্থলে না পৌঁছে অন্য কোন এয়ারপোর্টে নামতে বাধ্য হয়, তাহলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আপনার স্ত্রী স্মার্ট্ হলেও কেবল বিশ্বাসের উপর ভরসা করে হাদীস অমান্য করা তো উচিত নয় ভাইজান। তবে যদি বলেন, এমন সফর ছাড়া আমি নিরুপায়, তাহলে তার হিসাব আল্লাহর কাছে।

৪। মহিলা একাকিনী নিজের বাড়ির অথবা ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারের সাথে, একাকিনী রিক্সায় রিক্সা-ওয়ালার সাথে অথবা একাকিনী অন্য কোন বেগানা পুরুষের সাথে হাঁটা পথে সফর করবে না।

৫। অবিবাহিতার সফরে পিতার এবং বিবাহিতার সফরে স্বামীর অনুমতি জরুরী।

৬। সফরে বের হওয়ার সময় মহিলা শরয়ী পর্দার সাথে বের হবে এবং কোন পারফিউম বা সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। চলার পথে কোন দৃষ্টি-আকর্ষী ভঙ্গিমা প্রদর্শন করবে না। এমন কোন (জুতা বা অলংকারের) শব্দ প্রকাশ করবে না, যাতে পরপুরুষের মন প্রলুব্ধ হয়।

৭। পারলে বৃহস্পতিবার এবং সকাল সকাল সফরে বের হন। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ বৃহস্পতিবার সফরে বের হতে পছন্দ করতেন। *(আহমাদ ১৫৩৫৪, বুখারী ২৯৫০নং)*

সখ্‌র গামেদী ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।" আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সখ্‌র ؓ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আহমাদ, আবু দাউদ ২৬০৬, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ২২৭০নং)*

৮। নিরুপায় না হলে জুমআর দিন জুমআর আযান হওয়ার পর সফর করা উচিত নয়। যেহেতু তাতে ইচ্ছাকৃত জুমআহ নষ্ট হবে। আর মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(সূরা জুমুআহ ৯ আয়াত)*

৯। বাড়িতে পরিজনের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করুন। কারো আমানত বা ঋণ থাকলে প্রত্যর্পণ ও পরিশোধ করুন। কারণ, আপনি জানেন না যে, সফর শেষে বাড়ি ফিরতে পারবেন কি না? অতএব পরিজনকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে আপনি তাঁরই উপর ভরসা করে ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ পড়ুন ঃ-

ক- **بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىاللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.**

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই।

এই দুআ পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। *(আবু দাউদ ৪/৩২৫, তিরমিযী ৫/৪৯০)*

খ- আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই দুআ পড়তে হয়,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُذَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা আন আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ য়্যুজহালা আলাইয়্যা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫২)*

১০। মুসাফির সফরে বের হলে তাকে বিদায় দিন এবং তার জন্য দুআ করুন। তার বিদায়কালে নিম্নের দুআ বলুন।

(ক) **أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.**

উচ্চারণঃ- আস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।

অর্থঃ- আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি। *(আহমদ ২/৭, সহীহ তিরমিযী ২/ ১৫৫)*

(খ) **زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ.**

উচ্চারণঃ- যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া অ গাফারা যামবাকা অ য়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইষু মা কুন্ত্।

অর্থঃ- আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করুন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৫)*

(গ) **اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাত্বি লাহুল বু'দা অ হাউবিন আলাইহিস সাফার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি ওর জন্য (সফরের) দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও। *(তিরমিযী)*

সফরকারীও সেই মুহূর্তে নিজের পরিবারের জন্য দুআ করবে এবং বলবে,

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণঃ- আস্তাউদিউকুমুল্লা-হাল্লাযী লা তাযীউ অদা-ইউহ।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি যাঁর আমানত নষ্ট হয় না। *(আহমাদ ২/৪০৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/ ১৩৩)*

১১। যানবাহনে চড়লে চড়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলুন। চড়ে বসে বলুন, 'আলহামদু লিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করুন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

অর্থঃ- পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবব। *(সূরা যুখরুফ ১৩-১৪ আয়াত)*

অতঃপর 'আলহামদু লিল্লা-হ' ৩বার, 'আল্লাহু আকবার' ৩বার পড়ে নিম্নের দুআ পড়ুন,

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না। *(আবূ দাউদ ৩/৩৪, সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৬)*

প্রকাশ যে, জলজাহাজে বা নৌকায় চড়ে দুআর হাদীসটি যয়ীফ।

১২। অতঃপর সফরে বের হওয়ার দুআ বলুন ঃ-

সফরে বের হওয়ার সময় যানবাহনে চড়ে নিম্নের দুআদি পঠনীয়;

আল্লাহু আকবার ৩বার। অতঃপর পূর্বোক্ত 'সুবহানাল্লাযী----' পাঠ করে এই দুআ পড়তে হয়,

اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অতত্তাক্বওয়া অমিনাল আমালি মা তারয়্বা। আল্লা-হুম্মা হাউবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্‌বি আন্না বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ স্বা-হিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিল আহল্। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'সা-ইস্ সাফারি অকাআ-বাতিল মানযারি অসূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি অলআহল্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম, এবং সেই আমল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি

তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মালধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২/৯৯৮)*

১৩। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব।
মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তুমি তোমার বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার ইচ্ছা কর, তখন দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। এই নামায তোমাকে (বাড়ির) বাইরের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে। আর যখন তুমি বাড়ি প্রবেশ করবে, তখনও দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। এই নামায তোমাকে (বাড়ির) ভিতরের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে। *(বায্যার, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩২৩নং)*

১৪। পথিমধ্যে যানবাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে শয়তানকে গালি দেবেন না।
ঘোড়া, উঁট বা গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে শয়তানকে গালিমন্দ করতে নেই। কারণ এতে সে তৃপ্তি পায়। তাই এই সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। তাতে শয়তান ছোট হয়ে যায়। *(আবু দাউদ ৪/২৯৬)*

১৫। পথ চলতে চলতে আল্লাহর যিক্র করুন।
পথ চলাকালে উঁচু জায়গায় উঠতে 'আল্লাহু আকবার' এবং নিচু জায়গায় নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলা কর্তব্য। *(বুখারী ৬/ ১৩৫)*

১৬। সফরে যানবাহনের উপরেও নফল নামায পড়তে পারেন। ফরয নামাযের সময় হলে এবং যানবাহন থামা সম্ভব না হলে যদি গন্তব্যস্থল আসার আগেই নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে অবশ্যই ফরয নামাযও যানবাহনে পড়ে নিতে হবে। *(সালাতে মুবাশ্শির দ্রঃ)*

১৭। সফরে রাত্রিকালে কোন ফাঁকা জায়গায় ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিতে হলে রাস্তার উপর শোবেন না। কারণ রাত্রের অন্ধকারে হিংস্র প্রাণীরা মানুষের চলা-পথে অবতরণ করে। এ ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। *(মুসলিম ১৯২৬নং প্রমুখ)*

১৮। সফরে কোন অচেনা স্থানে বিশ্রামের সময় নিম্নের দুআ পড়ুন ঃ-

أَعُوْذُ بِكَلِمَات اللهِ التَّامَّات مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।
অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
এই দুআটি পড়লে ঐ স্থানের কোন কিছু আর অনিষ্ট করতে পারে না। *(মুসলিম ৪/২০৮০)*

১৯। কোন গ্রাম বা শহর প্রবেশকালে সেখানকার লোকদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে নিম্নের দুআ পড়ুন ঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا۔

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব্‌ই অমা আযলালনা, অরাব্বাল আরায্বীনাস সাব্‌ই অমা আক্বলালনা, অরাব্বাশ্ শায়া-ত্বীনি অমা আয্বলালনা, অরাব্বার রিয়া-হি অমা যারাইনা, আসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্বারয়্যাতি অখাইরা আহলিহা অখাইরা মা ফীহা। অ আউযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি আহলিহা অশার্রি মা ফীহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছু তা উড়িয়ে থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি। *(হাকেম ২/ ১০০, ইবনুস সুন্নী ৫২৪)*

২০। কোন বাজার প্রবেশ করলে প্রচুর সওয়াবের আশায় নিম্নের দুআ পাঠ করুন ঃ-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূত, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই নিমিত্তে সারা রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

বাজার প্রবেশ করে এই দুআটি যে পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ১০ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করবেন, তার ১০ লক্ষ পাপ মোচন করে দেবেন, তাকে ১০ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।” *(সহীহ তিরমিযী২/ ১৫২, হাকেম ১/৫৩৮)*

২১। সফরকারীর ভোরের যিক্‌র পাঠ করুন ঃ-

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِه عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا
وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ- সামিআ সা-মিউন বিহামদিল্লা-হি অহুসনি বালা-ইহী আলাইনা, রাব্বানা স্বা-হিবনা অ আফযিল আলাইনা, আ-ইযাম বিল্লা-হি মিনান্না-র।

অর্থঃ- শ্রবণকারী (আমাদের) আল্লাহর প্রশংসা ও আমাদের উপর উত্তম পরীক্ষার (শুক্‌র) শ্রবণ করেছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থী। *(মুসলিম ২৭১৮নং)*

২২। সফরের কাজ শেষ হলে অতি সত্বর বাড়ি ফিরে আসুন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "সফর হল আযাবের একটি টুকরা। সফর তোমাদেরকে (নিয়মিত) পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং নিজ প্রয়োজন শেষ হলেই পরিবারের প্রতি সত্বর প্রত্যাবর্তন কর।" *(বুখারী ১৮০৪, মুসলিম ১৯২৭নং প্রমুখ)*

২৩। লম্বা সফর থেকে বাড়ি ফিরার আগে পরিবারের লোক যদি আপনার আসার খবর না জানে, তাহলে রাত্রে হঠাৎ করে বাড়ি প্রবেশ করবেন না। কারণ এতে হয়তো আপনি আপনার পরিবারে এমন কিছু লক্ষ্য করবেন, যা আপনি পছন্দ করেন না। আর তাতে আপনার সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং বাড়ির কাছাকাছি কোন জায়গায় রাত কাটিয়ে দিনের বেলায় বাড়ি প্রবেশ করা উচিত। বরং সম্ভব হলে আগে খবর পাঠানো দরকার।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন (সফর থেকে) রাত্রে ফিরে আসে, তখন সে যেন অবশ্যই নিজ পরিবারের কাছে রাত্রেই প্রবেশ না করে। যাতে (ঐ মুসাফিরের) স্ত্রী অপ্রয়োজনীয় লোম সাফ করে এবং এলো কেশ আঁচড়ে নিতে পারে।" "বাড়ির লোকের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা এবং তাদের ত্রুটি খোঁজার উদ্দেশ্যে রাতে রাতে বাড়ি প্রবেশ না করে। *(বুখারী ১৮০১, মুসলিম ৭১৫নং)*

অবশ্য এই উদ্দেশ্যে আর একটি সুন্নাহ পালন করলে উপকৃত হবেন। আর তা হল এই যে, সফর থেকে এসে বাড়ি প্রবেশের পূর্বে মসজিদে গিয়ে ২ রাকআত নামায পড়ুন। তাহলে সেই সময়ের মধ্যে আপনার পৌঁছে যাওয়ার খবরও বাড়িতে পৌঁছে যাবে। মহানবী ﷺ সফর থেকে ফিরে বাড়ি প্রবেশের আগে মসজিদে গিয়ে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ৩০৮৮, মুসলিম ২৭৬৯নং প্রমুখ)*

২৪। সফর থেকে বাড়ি ফিরে এলে সফরে বের হওয়ার সময় দুআটির সাথে নিম্নের

দুআটিও যোগ করবেন,

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ۔

উচ্চারণঃ- -------আ-ইবূনা তা-ইবূনা আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ- -----(আমরা সফর থেকে) প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। *(মুসলিম ২/৯৯৮)*

২৫। জিহাদ বা হজ্জ থেকে ফিরে এলে নিম্নের দুআ পড়বেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

অতঃপর সফর থেকে ফিরে আসার উপরোক্ত (আ-ইবূনা---) দুআটি পড়বেন। তারপর এই দুআটি যুক্ত করবেন,

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

উচ্চারণঃ- স্বাদাক্বাল্লা-হু অ'দাহ, অনাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার সত্য করেছেন, তিনি তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন। *(বুখারী ৭/ ১৬৩, মুসলিম২/৯৮০)*

২৬। ঘরে প্রবেশ করতে 'বিসমিল্লাহ' বলুন।

ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্র করা উত্তম। এতে শয়তান ঘরে স্থান পায় না। *(মুসলিম ৩/ ১৫৯৮)* এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দুআ (খাইরাল মাওলাজ) এর হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফ আবু দাউদ ১০৯১নং, ৫০৫পৃঃ)*

রাস্তার আদব

বহুজন যায় যেই দিকে,
পথ তারে কয় সর্বলোকে।

যেখানেই মানুষ ও সমাজ আছে, সেখানেই রাস্তা আছে। রাস্তা কিন্তু কারো একা চলার জন্য নয়। তাছাড়া রাস্তার ধারে-পাশে থাকে ঘর-বাড়ি, দোকান-পসার। রাস্তায় চলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব শ্রেণীর মানুষ। আর এই জন্যই রাস্তা সম্পর্কীয় বিভিন্ন আদব রয়েছে ইসলামে।

মহানবী ﷺ বলেন, "খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার হক

কি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।” *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে’ ২৬৭৫ নং)*

১। সুতরাং রাস্তার হক আদায় করুন। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসে যে সকল হকের কথা বলা হয়েছে, তাই কিন্তু শেষ নয়। বরং এ ছাড়াও আরো হক অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা দেখি, সেই হকগুলি কি কি?

(ক) দৃষ্টি সংযত রাখা।

রাস্তায় যেহেতু নারী-পুরুষ সকলেই হাঁটে, সেহেতু রাস্তার ধারে বসার সময় এবং রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টি অবনত করে রাখা জরুরী। যাতে পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের এমন জায়গা নজরে না পড়ে, যা দেখা কারো জন্য বৈধ নয়। কারণ, নজর থেকেই শুরু হয় হৃদয়ের গুপ্ত প্রণয়। তাছাড়া নজরে হয় এক প্রকার ব্যভিচার। মহানবী ﷺ বলেন, “চোখ দু’টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু’টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু’টিও। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।” *(মিশকাত ৮৬ নং)*

আর তার জন্যই মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

অর্থাৎ, মু’মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু’মিনা নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে---। *(সূরা নূর ৩০-৩১ আয়াত)*

সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, “একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭৯৫৩ নং)*

হযরত জারীর (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘কোন মহিলার উপর আমার আচমকা নজর পড়ে গেলে আমি কি করব?’ তিনি বললেন, “তোমার

নজর ফিরিয়ে নাও।” *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ১০১৪ নং)*

অনুরূপভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কারো প্রতি বদ-নজর বা হিংসার নজর দ্বারা দৃষ্টিপাত না করা।

(খ) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

পথের ধারে বসলে অথবা পথে চলাকালে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। যদিও অপরকে কষ্ট দেওয়া যে কোন সময়ে হারাম, তবুও যেহেতু ঘরে থাকার চাইতে বাইরে রাস্তায় অপরকে কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কা বেশী তাই রাস্তায় কাউকে কষ্ট না দেওয়া রাস্তার একটি হক গণ্য করা হয়েছে।

আসল “মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিভ ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে।” *(বুখারী ১০, মুসলিম ৪০নং প্রমুখ)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে ভালো কাজ কি? উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।” আমি বললাম, কোন্ শ্রেণীর ক্রীতদাস মুক্ত করা সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন, “যা মূল্যে সবচেয়ে বেশী এবং তার পরিবারের নিকট উত্তম।” আমি বললাম, “আমি যদি তা না পারি? তিনি বললেন, “তবে কোন কারিগরের সহযোগিতা কর অথবা যে কারিগর নয় তার কাজ করে দাও।” আমি বললাম, তাও যদি না পারি? তিনি বললেন, “তাহলে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকবে। আর সেটা হবে তোমার তরফ থেকে কৃত সদকাহ।” *(বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪নং প্রমুখ)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

অর্থাৎ, যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

(গ) সালামের জওয়াব দেওয়া।

যেহেতু রাস্তার ধারে বসলে অথবা রাস্তায় চললে অনেকের সাথে দেখা হবে এবং অনেকে সালামও দেবে, সেহেতু সালামের সঠিকভাবে জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব। *(এ ব্যাপারে সালামের আদব দেখুন।)*

(ঘ) সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করা।

রাস্তার মাঝে কত রকম অন্যায় ও পাপ ঘটতে দেখা যায় সচরাচর। অতএব অন্যায় দেখে অকারণে চুপ থাকা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। তদনুরূপ যথাসাধ্য

সৎকাজের আদেশ দিতেও মুসলিম আদিষ্ট। এ ব্যাপারে শরীয়তে যথেষ্ট গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছেঃ- মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; মানুষের জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্যে বাধা দান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)*

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্যে বাধা দান করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। *(সূরা আ-লে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু; এরা (লোককে) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতিই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করা সদকাহ স্বরূপ। আবু যার্র ﷺ বলেন, কিছু লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল? ধনী ব্যক্তিরাই সমস্ত নেকীগুলো লুটে নিল! ওরা নামায পড়ে, যেমন আমরা পড়ি। ওরা রোযাও রাখে, যেমন আমরা রাখি। উপরন্তু ওরা ওদের উদ্বৃত্ত অর্থাদি সদকাহ করে থাকে।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদেরকে এমন কিছু প্রদান করেননি যদ্দ্বারা তোমরাও সদকাহ (দান) কর? (শোন!) প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, সৎকাজে (মানুষকে) আদেশ (ও উদ্বুদ্ধ) করা হল সদকাহ এবং মন্দকাজে (তাদেরকে) বাধা দেওয়াও হল সদকাহস্বরূপ।" *(মুসলিম ১০০৬ নং)*

মা আয়েশা رضـــي الله عنـــها বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানকে ৩৬০টি গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (প্রত্যহ এর প্রত্যেকটির তরফ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকাহ।) সুতরাং যে ব্যক্তি ৩৬০ সংখ্যক 'আল্লাহু আকবার' বলে বা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে বা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে বা 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে বা 'আস্তাগফিরুল্লা-হ' বলে বা মানুষের পথ থেকে পাথর সরিয়ে দেয় বা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয় বা সৎকর্মে আদেশ দেয় বা মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করে, সে ব্যক্তি (সে দিনের জন্য) দোযখ থেকে নিজেকে সুদূরে করে নেয়।" *(মুসলিম ১০০৭ নং)*

মন্দকাজে বাধা দেওয়ার যে বড় মাহাত্ম্য রয়েছে, তার বর্ণনা দিয়ে মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে পূর্বের (সাহাবার) মত সওয়াব দান করা হবে। তারা মন্দকাজে বাধাদান করবে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ২২২৪নং)*

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা না দেওয়া এবং এ ব্যাপারে তোষামোদ করা মোটেই উচিত নয়। যেহেতু যারা সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করা হতে বিরত থাকে তারা অভিশপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (٧٩)

অর্থাৎ, বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে যারা (কুফ্র) অবিশ্বাস করেছিল তারা দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-আয়াত)*

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সাধ্যমত সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করার দায়িত্ব পালন করা। তা না পারলে জানতে হবে তার ঈমানে দুর্বলতা আছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

তিনি আরো বলেন, "আমার পূর্বে যে উম্মতের মাঝেই আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন সেই নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে খাস ভক্ত ও সহচর ছিল; যারা তাঁর তরীকার

অনুগামী ও প্রত্যেক কর্মের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন অসৎ উত্তরসুরিদের আবির্ভাব হয়; যারা তা বলে যা নিজে করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ (সংগ্রাম) করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হৃদয় দ্বারা সংগ্রাম করে (ঘৃণা করে) সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে (অর্থাৎ ঘৃণা না করলে কারো হৃদয়ে) সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকতে পারে না।” *(মুসলিম ৫০নং)*

সমাজ হল সমুদ্রবক্ষে চলমান একটি পানিজাহাজের মত। সমাজে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করা না হলে সেই জাহাজ ডুবে যাবে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, ‘তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।’) নিচের তলার লোকেরা বলল, ‘আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে নিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।” *(বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩নং)*

যারা সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করায় আগ্রহ প্রকাশ করে না, তারা অচিরেই আযাবগ্রস্ত হয় এবং তাদের দুআ কবুল হয় না।

মহানবী ﷺ বলেন, “সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অতি

অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর তাঁর কোন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে; কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০৭০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমাদ ৪/৩৬৪, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৪৬ নং)*

একদা হযরত আবূ বকর ﷺ দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা অবশ্যই এই আয়াত পাঠ করে থাকঃ-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। *(সূরা মা-ইদাহ ১০৫ আয়াত)*

কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না, তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক করে দেন।" *(আহমাদ, আসহাবে সুনান, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৮নং)*

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান না করলে সমাজে ফিতনা আপতিত হবে। আর তার ফলে সমাজের লোকেদের হৃদয় অনুভূতিহীন হয়ে যাবে। তখন মন্দকে মন্দ বলে মনেও হবে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ

পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।” *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

বলা বাহুল্য, ‘যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে’ বলে কেউ রেহাই পাবে না। বরং কাউকে কাঠ খেতে দেখে চুপ থাকলে, বাধা না দিলে, প্রতিবাদ না করলে, অথবা কমপক্ষে ঘৃণা না জানলে দেখনে-ওয়ালাকেও আঙ্গার হাগতে হবে। পেষণ যখন আসবে তখন ‘হেঁটকার সাথে মসুরিও পেষা’ যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ- তোমরা সেই ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থেকো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।” *(সূরা আনফাল ২৫ আয়াত)*

সুতরাং অনাচারীর বিরুদ্ধে সদাচারীকে প্রতিবাদে নামতে হবে। নচেৎ,

‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।’

(ঙ) পথিককে পথ বলে দেওয়া।

পথের ধারে বসলে অথবা পথ চললে পথভ্রান্ত পথিককে পথ চিনিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এ কাজেও সদকাহ সমান নেকী রয়েছে। *(বুখারী ২৮৯১নং)*

অবশ্য মন্দ কাজ ও খারাপ জায়গার পথ বলে দিবেন না। এতে আপনার গোনাহ হবে। যেমন কেউ মাজার, সিনেমা হল, শুঁড়িশাল বা বেশ্যাখানা কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন না এবং তাকে উল্টা বা মিথ্যাও বলবেন না। সঠিক হেদায়াত না করতে পারলেও উচিত জবাব দিয়ে আপনার নিকট থেকে বিদায় করবেন।

২। পথিকের পথ চলতে বাধাসৃষ্টিকারী অথবা কষ্টদানকারী কোন জিনিস (ভাঙ্গা ডাল, মোটা পাথর, কাঁটা, কাঁচ, কোন নোংরা জিনিস, কলার ছাল ইত্যাদি) পথে ফেলবেন না। পড়ে থাকলে তা দূর করে দিন। এ কাজে আপনার ঈমানের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তাতে সদকাহ পরিমাণ সওয়াবও পাবেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ঈমান হল ষাট অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা, সবচেয়ে ছোট শাখা হল, রাস্তা থেকে

কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা।” *(মুসলিম ৩৫, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।” সকলে বলল, ‘এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে দুই রাকআত চাশ্‌তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

এ কাজে আপনার পাপও ঝরে যাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে তাতে একটি কাঁটার ডাল পেল, সে সেটিকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন এবং তাকে পাপমুক্ত করে দিলেন।” *(বুখারী, মুসলিম ১৯১৪নং)*

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারব। তিনি বললেন, “মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর কর।” *(মুসলিম ২৬১৮নং)*

৩। পথের মধ্যে অপর পথিকের সহযোগিতা করুন। তার বোঝা বহনে সাহায্য করুন। আপনার গাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে তার হাঁটার কষ্ট লাঘব করুন। এতেও আপনার সদকাহ তুল্য নেকী রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, “---কাউকে নিজের সওয়ারীতে চড়িয়ে নিলে সদকাহ করা হয়। অপরের ভারী জিনিস নিজের সওয়ারীতে চাপিয়ে বহন করে দিলে সদকাহ করা হয়।” *(আহমাদ ২৭৪০০, বুখারী ২৮৯১, মুসলিম ১০০৯নং)*

৪। পথে প্রস্রাব-পায়খানা করবেন না। কারণ, এ কাজে সাধারণ পথিক কষ্ট পায় এবং তাতে প্রকাশ্যে বা মনে মনে গালি দিয়ে থাকে। আর তাই এ কাজ হল অভিশাপ আনয়নকারী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।” *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

অনুরূপভাবে আপনি নিজেও বাড়ির নোংরা ফেলে রাস্তা নোংরা করবেন না এবং কোন কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করবেন না। নচেৎ আপনিও হবেন অভিশপ্ত।

৫। সাধারণতঃ নারী হল লজ্জাশীলা। আর লজ্জার দাবী হল এই যে, পথ চলতে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, পুরুষের দলে একাকার হয়ে মাঝপথে চলবে না। বরং রাস্তার এক সাইড ধরে পথ চলবে।

একদা মহিলারা নামায পড়ে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তার মধ্যে তারা পুরুষদের সাথে মিশে গেল। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "থামো! তোমাদের জন্য রাস্তার মাঝে চলা বৈধ নয়। তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চল।" এ নির্দেশ শুনে মহিলা (রাস্তার পাশে বাড়ির) দেওয়ালের সাথে লেগে পথ চলত। এমনকি দেওয়াল ঘেষে চলার ফলে তার কাপড় দেওয়ালে আটকে যেত! *(আবূ দাঊদ ৫২৭২নং)*

অপরের গৃহ-প্রবেশে অনুমতির আদব

কোন মুসলিমের জন্য অপরের গৃহে বিনা অনুমতিতে সরাসরি প্রবেশ করা বৈধ নয়। যেহেতু আপনি জানেন না যে, বাড়ির ভিতরের লোক কোন্ অবস্থায় আছে। গৃহের ভিতর হয়তো আগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন আছে। যা দেখে হয়তো আপনার মনে সেই গৃহ ও গৃহবাসীদের প্রতি ঘৃণার দানা বাঁধবে। হয়তো বা আপনার দৃষ্টি এমন জায়গায় পড়বে, যা আপনার জন্য দেখা বৈধ নয় অথবা গৃহবাসী আপনাকে দেখাতে রাযী নয়। আর তার ফলে তাদের মনেও আপনার প্রতি ঘৃণার অঙ্কুর উদ্গত হবে। এই জন্যই মহান আল্লাহর বিধান হল, পরগৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ফরয এবং বিনা অনুমতিতে পরকীয় গৃহে প্রবেশ নিষেধ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াত)*

১। কারোর বাড়িতে প্রবেশের দরকার হলে অথবা কোন বাড়ির কাউকে ডাকতে হলে অথবা কোন বাড়ির কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তার বাড়ির সামনে এসে তার দরজার সোজাসুজি দাঁড়াবেন না। বরং দরজার বাম অথবা ডান পাশে আড়ালে দাঁড়াবেন। যাতে দরজা খোলা থাকলে তার বাড়ির ভিতরে আপনার নজর না যায়। আর এই নজরের জন্যই তো অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহানবী ﷺ এই ভাবেই অন্যের দরজায় দাঁড়াতেন। *(আহমাদ ১৭২৩৯, আবূ দাঊদ ৫১৮৬নং)* এবং তাঁর দরজার সামনে কেউ দাঁড়ালে তাকেও ঐ নিয়মে দাঁড়াতে শিক্ষা দিতেন। *(আবূ দাঊদ ৫১৭৪নং)*

২। জেনে রাখুন যে, কারো বিনা অনুমতিতে তার বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিপাত করা হারাম। দরজা অথবা জানালা দিয়ে, রাস্তা থেকে অথবা অন্য বাড়ির ছাদ বা জানালা থেকে, গাছ বা গাড়ির উপর থেকে কারো বাড়ির ভিতরে নজর দিলে নজরবাজের চোখ ফুটিয়ে দেওয়া বৈধ করা হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮-নং, আবূ দাঊদ, নাসাঈ)*

এই বৈধতার মানে হল, ঐ দোষে চোখ ফুটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে যদি কোন নজরবাজ ইসলামী আদালতে বিচারপ্রার্থী হয়, তাহলে তার বিচারে কোন প্রকার দন্ড ও প্রতিশোধমূলক শাস্তি নেই।

৩। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির লোকের উদ্দেশ্যে কিছু বলার অথবা প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার পূর্বে সালাম দিন। বলুন, 'আস্সালামু আলাইকুম। অমুক কি বাড়িতে আছেন' বা 'আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' *(দলীল স্বরূপ দেখুন ঃ আহমাদ ১৪৯৯৯,২২৬১৭, আবূ দাঊদ ৫১৭৬, ৫১৭৭, তিরমিযী ২৭১০নং, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ ৪২০পৃঃ)*

৪। সালাম ও কথা বলার পর যদি কোন সাড়া না পান, তাহলে তিনবার একই রূপ বলুন। তাতে যদি কোন সাড়া বা অনুমতি না পান, তাহলে সেখান হতে ফিরে যান। খবরদার সে বাড়িতে প্রবেশ করবেন না।

যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তিন তিনবার (কারো বাড়ি প্রবেশের) অনুমতি নেয় এবং তাকে অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।" *(বুখারী ৬২৪১, মুসলিম ২১৫৬নং)*

অবশ্য যদি সুনিশ্চিত হন যে, বাড়ির লোক আপনার আওয়াজ শুনতে পায়নি,

তাহলে সে ক্ষেত্রে ৩ বারের অধিক ডাকাহাঁকা করাতে দোষ নেই। *(ফাতহুল বারী ১১/২৯, তামহীদ ইবনে আব্দুল বার্র ৩/ ১৯২)*

৫। আপনার ডাকে বাড়ির ভিতর থেকে 'কে?' প্রশ্ন এলে উত্তরে আপনি আপনার সুপরিচিত নাম ও পরিচয় বলুন। নচেৎ উত্তরে কেবল 'আমি' বলবেন না। অবশ্য নিজ নাম নিয়ে 'আমি অমুক' বা 'অমুকের আব্বা' বলতে পারেন। *(দলীল স্বরূপ দেখুনঃ বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫, আল-আদাবুল মুফরাদ ১০৮৭নং)*

৬। দরজায় আঘাত করে আওয়াজ দেওয়ার দরকার হলে মৃদু আঘাত করুন। করাঘাত নয়; বরং নখাঘাত করুন। মহানবী ﷺ-এর দরজায় নখাঘাতই করা হত। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১০৮০নং)*

অবশ্য বাড়ির ভিতরে বসবাসের কক্ষ দূরে হলে সেই অনুযায়ী সজোরে আঘাত করা দূষণীয় নয়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সেই আঘাতে বাড়ি-ওয়ালা বিরক্ত না হয়ে যায়। *(ফাতহুল বারী ১১/৩৮)* অথবা বাড়ির লোক ঘাবড়ে ও শিশুরা ভয় খেয়ে না যায়।

অনুরূপ খেয়াল রাখা দরকার কলিং বেল মারার সময়। কোন জবাব না আসার আগে একটানা বার বার রিং করে যাওয়া বেআদবের পরিচয়।

৭। বাড়ির লোক যদি বলে, 'এখন ফিরে যান' অথবা 'পরে আসুন' তাহলে মনের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা, কুধারণা বা বিরক্তি না নিয়েই ফিরে যান। এটাই আল্লাহর আদেশ।

৮। বাড়ির মধ্যে কেউ না থাকলেও প্রবেশ করবেন না। কারণ, পরের বাড়িতে তার অনুপস্থিতিতে প্রবেশ করলে আপনার প্রতি কুধারণা জন্মাতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াত)*

৯। কেউ যদি আপনাকে ডেকে পাঠায় এবং আপনি তার সাথে বাড়ি প্রবেশ করেন, তাহলে পৃথক অনুমতির দরকার নেই। যেহেতু ডেকে পাঠানোটাই আপনার জন্য

অনুমতি। *(আবূ দাঊদ ৫১৮৯-৫১৯০নং)*

তবে পাঠানো লোকের সাথে না এসে যদি একাকী আসেন, তাহলে বাড়ি প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই অনুমতি লাগবে।

১০। আপনি কোন মজলিস, মিটিং বা পরামর্শ-সভায় থাকলে আমীরের নিকট অনুমতি না নিয়ে কোন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে উঠে যাবেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারাই হল প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং রসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। সুতরাং তারা তাদের কোন ব্যক্তিগত কাজে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে তুমি অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নূর ৬২ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কেউ তার ভায়ের সাক্ষাতে গিয়ে তার নিকট বসবে, তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া অবশ্যই না ওঠে।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮২নং)*

১১। ঘরে কেবল মা-বোন থাকলেও ঘরে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে অনুমতি নিন। কারণ ঘরের ভিতর তারা এমন অবস্থায় থাকতে পারে, যে অবস্থায় আপনি তাদেরকে দেখতে পছন্দ করেন না। *(দলীল স্বরূপ দেখুন ঃ আল-আদাবুল মুফরাদ ১০৫৯, ১০৬৩নং, তামহীদ ১৬/২২৯)*

১২। ঘরে কেবল স্ত্রী থাকলেও ঘরে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে অনুমতি নিন। কারণ ঘরের ভিতর সে এমন অবস্থায় থাকতে পারে, যে অবস্থায় আপনি তাকে দেখতে অপছন্দ করেন।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে জুতোর শব্দ অথবা গলা সাড়া দিলেও চলে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৩/২৮০, আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ১/৪২৪-৪২৫)*

১৩। নাবালক শিশু অথবা ক্রীতদাসের জন্যও তিন সময়ে অনুমতি নেওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে স্পষ্ট বিবৃতি এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি (নাবালক) তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর (বাহ্যাবরণ খুলে রাখ) তখন এবং এশার নামাযের পর, এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (যেহেতু তারা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তাদের নজর তোমাদের এমন অঙ্গে পড়তে পারে, যেখানে নজর দেওয়া অনুচিত।) তবে এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো সর্বদা যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। *(সূরা নূর ৫৮-৫৯ আয়াত)*

আল্লাহর বিধান পালনে সমাজ ও সংসারে রয়েছে যাবতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা। অবশ্য এই বিধান মানার সাথে সাথে পর্দার বিধানও ঘাড় পেতে মেনে নিতে হবে। নচেৎ যে বাড়ি নিহাতই খোলামেলা এবং অবারিত-দ্বার; প্রাচীর বা ঘেড়া-বেড়া থাকলেও যে বাড়িতে প্রবেশে কোন প্রকার বাধা নেই অথবা প্রাচীর ও অন্তরাল না থাকার ফলে ইচ্ছা না থাকলেও বাহির থেকে ভিতরের হেরেম দেখা যায়, যে গৃহে সরকারী ভাবী ও বোনদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা ছাড়াও হুড়াহুড়ি করার সুযোগ আছে, সে বাড়ি ও সে গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়ার কথা বলা মানে কাউকে বাম হাতে মদ খেতে দেখে ডান হাতে খেতে বলা নয় কি? নৈতিক অবক্ষয়প্রাপ্ত এই সমাজকে আল্লাহ সুমতি দিন। আমীন।

সালামের আদব

পরস্পর সম্প্রীতি অক্ষুন্ন ও সতেজ রাখার জন্য ইসলামের বিধানে সালাম একটি সুন্দর ব্যবস্থা। সাক্ষাতের সময় একে অন্যের চেহারার দিকে না তাকালে, একটু মুচকি না হাসলে, কথা না বললে স্বাভাবিকভাবে উভয়ের মনে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। কিন্তু হাসিমুখে সালাম দিয়ে কথা বললে মহব্বত ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আর সেটাই হল ইসলামের কাম্য।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

তিনি আরো বলেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

আস্-সালাম হল মহান আল্লাহর অন্যতম নাম এবং সালাম মানে শান্তি। সুতরাং সালাম দিয়ে ও নিয়ে এ দুআই করা হয় যে, আস্-সালাম আল্লাহ তোমার সাথী হোক অথবা তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম দেওয়ার বড় মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াত)*

নিজ ঘরেও প্রবেশকালে সালাম দেওয়ার গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

সালামের জবাবে সালাম প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা অনুরূপই করবে। *(সূরা নিসা ৮৬)*

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, মুসলিমের উপর মুসলিমের ৬টি হক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, তা কি কি হে আল্লাহর রসূল? বললেন, "যখন তার সাথে দেখা হবে, তখন তাকে সালাম দেবে।---" *(মুসলিম ২১৬২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

আনাস ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "বেটা! তুমি তোমার পরিবারে প্রবেশ করলে সালাম দিও; এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বর্কত হবে।" *(তিরমিযী ২৬৯৮-নং)*

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, 'কোন্ ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন্ কোন্ কাজ উত্তম কাজ?) উত্তরে তিনি বললেন, "(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।" *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মু'মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না, যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ৫৪ নং)*

আসলে যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে, সে সবচেয়ে বড় কৃপণ। মহানবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে বড় চোর সে, যে নামায চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে, যে সালাম দিতে বখীলি করে।" *(সহীহুল জামে' ৯৬৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দুআ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে

এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।” *(সহীহুল জামে’ ৯৬৬নং)*

১। সালাম দেওয়া সুন্নত; কিন্তু সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

সালাম দেওয়া সুন্নত এ কথা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর তার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ উপরে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সালাম না দিলে সুন্নত তরক হবে। কিন্তু সালামের উত্তর না দিলে ওয়াজেব তরক তথা তার জন্য কাবীরা গোনাহ হবে।

অবশ্য একটি জামাআত যদি অন্য জামাআতকে সালাম দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে একটি লোক সালাম দিলেই যথেষ্ট। অনুরূপ জামাআতের মধ্যে যদি একটি লোক তার উত্তর দেয়, তাহলে ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। *(আবূ দাঊদ ৫২১০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪১২, ইরওয়াউল গালীল ৭৭০নং)* অবশ্য প্রত্যেকের উত্তর দেওয়াটাই উত্তম।

২। সালাম ও তার জবাবের বাক্যাবলী

সালামের সবচেয়ে উত্তম বাক্য হল ঃ

আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।

অতঃপর ঃ আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ।

অতঃপর ঃ আস্-সালামু আলাইকুম।

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম।’ তিনি তার জওয়াব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নবী ﷺ বললেন, “১০টি সওয়াব এর জন্য। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।’ তিনি তার উত্তর দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “২০টি (সওয়াব এর জন্য।)” অতঃপর তৃতীয় আর একজন এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।’ (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর করুণা ও তাঁর অনেক বর্কত বর্ষণ হোক।) অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “৩০টি (সওয়াব এর জন্য।)” *(আহমাদ ১৯৪৪৬, তিরমিযী ২৬৮৯, সহীহ আবু দাউদ ৪৩২৭, দারেমী ২৬৪০নং)*

মহান আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে বললেন, ‘যাও ঐ সকল ফিরিশ্তাকে সালাম জানাও এবং মনোযোগ সহকারে শুনে দেখ, তারা কি উত্তর দেয়। সেটা হল তোমার ও তোমার বংশধরদের অভিবাদন।’ সুতরাং আদম গিয়ে তাঁদেরকে সালাম জানালেন ঃ ‘আসসালামু আলাইকুম।’ উত্তরে তাঁরা বললেন, ‘আস্সালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ।’ উত্তরে তাঁরা ‘অরাহমাতুল্লাহ’ অতিরিক্ত করলেন। *(বুখারী ৩৩২৬, মুসলিম ২৮৪১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যাকে সালাম দেওয়া হয় সে একা হলে 'আস্সালামু আলাইকা' এবং মহিলা হলে 'আস্সালামু আলাইকি' অথবা উভয়ের জন্য 'আস্সালামু আলাইক' বলা বৈধ। পক্ষান্তরে একা পুরুষ অথবা মহিলার ক্ষেত্রে এবং একাধিক লোকের ক্ষেত্রেও 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে সালাম দেওয়া বিধেয়।

পক্ষান্তরে সালামদাতার জন্য 'অবারাকাতুহ'র পরে অতিরিক্ত অন্য কোন শব্দ বলা বৈধ নয়।

যেমন 'আলাইকাস সালাম' বলে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তা মৃতের জন্য অভিবাদন। *(আবূ দাউদ ৫২০৯, তিরমিযী ২৭২২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪০৩নং)* অর্থাৎ, সে যুগের কবিরা সাধারণতঃ ঐ বলে মৃতকে সম্বোধন করে সালাম জানাতো।

উত্তরের বাক্যাবলী হবে সালামের থেকে উত্তম; বাক্যে, গলার স্বরে, ভাবে ও ভঙ্গিতে। তা না হলে সালামের অনুরূপ হওয়া জরুরী। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা অনুরূপই করবে। *(সূরা নিসা ৮৬)*

অতএব 'আস্-সালামু আলাইকুম'-এর জবাবে 'অআলাইকুমুস্-সালামু অরাহমাতুল্লাহ' এবং 'আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ'-এর জবাবে 'অআলাইকুমুস্-সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলা উত্তম। নচেৎ সালামদাতা যে বাক্যে সালাম দেবে, সেই বাক্য দিয়েই তার উত্তর দেওয়া জরুরী। সালাম অপেক্ষা তার উত্তর যেন নিকৃষ্টতর না হয়, নচেৎ সম্প্রীতির স্থানে বিদ্বেষ জন্ম নেবে।

পক্ষান্তরে 'আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ'র জবাবে অনুরূপ বাক্যই বলতে হবে। কারণ, অনেকের মতে এই শব্দাবলীর উপর বাড়তি কোন শব্দ (যেমন ঃ 'অমাগফিরাতুহ, অরিযওয়ানুহ, অইহসানুহ' ইত্যাদি) অতিরিক্ত করা যাবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ কর্তৃক সেরূপ কোন প্রমাণ নেই। মহান আল্লাহও আহলে বায়তের জন্য কেবল 'অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। *(সূরা হূদ ৭৩ আয়াত দ্রঃ)* তাছাড়া ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস 'অবারাকাতুহ'র পর অন্য শব্দ বাড়তি বলতে অপছন্দ করতেন। *(তামহীদ, ইবনু আব্দুল বার্র ৫/২৯৩)*

কিন্তু সালামের জবাবে 'অবারাকাতুহ'র পর 'অমাগফিরাতুহ' অতিরিক্ত করা সাহাবী যায়দ বিন আরকাম থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন, 'নবী ﷺ যখন আমাদেরকে সালাম দিতেন, তখন আমরা তার উত্তরে বলতাম, অআলাইকাস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু অমাগফিরাতুহ।' *(বুখারীর তারীখ কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৪৯নং)*

৩। সালাম ও তার উত্তর এমন উচ্চস্বরে বলতে হবে, যাতে শোনা যায়। বিশেষ করে

সালামের উত্তর যদি এমন শব্দে দেওয়া হয়, যাতে সালামদাতা শুনতে না পায়, তাহলে ওয়াজেব আদায় হবে না। আর তাতে গোনাহগার থেকে যেতে হবে। *(আযকার, নওবী ৩৫৪-৩৫৫পৃঃ)*

৪। সালাম দেওয়ার পর যদি সন্দেহ হয় যে, যাকে সালাম দেওয়া হল সে শুনতে পায়নি, তাহলে ৩ বার সালাম বলা মুস্তাহাব। আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপই করতেন। *(বুখারী ৬২৪৪নং)*

৫। পরিচিত হোক অথবা না হোক প্রত্যেক মুসলিমকে সালাম দেওয়া সুন্নত।

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, 'কোন্ ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন্ কোন্ কাজ উত্তম কাজ?) উত্তরে তিনি বললেন, "(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।" *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, লোকেরা কেবল পরিচিত লোককে সালাম দেবে।" *(আহমাদ ১/৪০৭-৪০৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৮নং)*

৬। অতিথি ও আগন্তুক ব্যক্তিরই সালাম দেওয়া সুন্নত। অর্থাৎ, যে বাইরে থেকে আসবে, সে ঘরে, মজলিসে বা মসজিদে এসে সালাম দেবে। যে ব্যক্তি ঘরে, মজলিসে বা মসজিদে থাকবে তার জন্য আগে বেড়ে আগন্তুককে সালাম দেওয়া সুন্নত নয়।

৭। সুন্নত হল ঃ উঁট, ঘোড়া, সাইকেল বা গাড়ির উপর সওয়ার লোক পায়ে হেঁটে যাওয়া লোককে, পায়ে হেঁটে যাওয়া লোক বসে থাকা লোককে, অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে, বয়সে ছোট মানুষ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সালাম দেবে। *(বুখারী ৬২৩১-৬২৩২, মুসলিম ২১৬০নং)*

কিন্তু যদি এর বিপরীতভাবে কেউ সালাম দেয়, তাহলে তা দোষের কিছু নয়। তবে অবশ্যই সে সুন্নাহ ও আফযলের খিলাপ কাজ করবে।

পক্ষান্তরে উভয় পক্ষ যদি মানে ও পরিমাণে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে থাকে। *(বুখারী ৬০৭৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৬নং)*

৮। একজনকে সালাম দেওয়ার পর গাছ বা দেওয়ালের আড়াল হয়ে পুনরায় দেখা হলে আবার সালাম দেওয়া সুন্নত। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো নিজ ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে কোন গাছ কিংবা দেওয়াল কিংবা পাথর আড়াল হওয়ার পর আবার সাক্ষাৎ হলে আবার সালাম দাও।" *(আবূ দাঊদ ৫২০০নং)*

৯। মহিলা কোন মাহরাম হলে অথবা গায়র মাহরাম বৃদ্ধা হলে তাকে সালাম দেওয়া বৈধ। নচেৎ গায়র মাহরাম কোন যুবতী মহিলাকে - বিশেষ করে ফিতনার ভয় থাকলে - তাকে সালাম দেওয়া এবং তার মুখ খোলানো বৈধ নয়।
আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মহিলাকে সালাম দেওয়ার কথা স্বতন্ত্র। কারণ তাঁদের মাঝে সে ফিতনার ভয় মোটেই ছিল না।

১০। শিশু হলেও তাকে সালাম দেওয়া সুন্নত এবং তা বিনয়ীর একটি নিদর্শন। আমাদের মহানবী ﷺ পথে চলাকালে ছোট শিশুদেরকে সালাম দিতেন। *(বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮নং)*
প্রকাশ থাকে যে, শিশু যদি সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে সে গোনাহগার হবে না। কারণ, সে শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত নয়। অবশ্য শিশু বড়কে সালাম দিলে উত্তর দেওয়া জরুরী। *(ফাতহুল বারী ১১/৩৫)*

১১। যেখানে কিছু লোক ঘুমিয়ে এবং কিছু লোক জেগে আছে, সেখানে এমন শব্দে সালাম দিতে হবে, যাতে জাগ্রত ব্যক্তি সালাম শুনতে পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না যায়। ইসলামী শরীয়তে এটি অন্যতম আদব। যাতে কারো কোন ক্ষতি ও ডিষ্টার্ব না হয়। এই আদব শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের মহানবী ﷺ। *(মুসলিম ২০৫৫নং)*

১২। সালাম হল একটি ইসলামী প্রতীক। সালাম হল এক প্রকার দুআ। আর এই দুআ করা হয় আল্লাহর কাছে। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস রাখে না তারা এ দুআর হকদার নয়। তাই অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া হারাম, বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "ইয়াহুদ ও নাসাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না। ওদের সাথে পথে সাক্ষাৎ হলে সংকীর্ণতার প্রতি বাধ্য কর।" *(মুসলিম ২১৬৭নং)*
তাছাড়া সালামে রয়েছে তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং কাফেরকে সালাম দিলে নিজেকে ছোট ও তাকে বড় গণ্য করা হয়। আর তা কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয়।
পক্ষান্তরে যদি কোন কার্যক্ষেত্রে কোন অমুসলিমকে অভ্যর্থনা জানাতেই হয়, তাহলে সালাম দিয়ে নয়; বরং অন্য কোন শব্দ বলে; যেমন 'সুপ্রভাত' বা 'গুডমর্নিং' বা 'কেমন আছেন' ইত্যাদি বলা প্রয়োজনে অনেকে বৈধ বলেছেন। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ১/৩৯১, আযকার, নওবী ৩৬৬-৩৬৭পৃঃ)*

১৩। অমুসলিমরা যদি আমাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়, তাহলে তার উত্তর দেওয়া আমাদের জন্য ওয়াজেব হবে। যেহেতু সাধারণভাবেই আল্লাহ বলেন, "যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন

করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। *(সূরা নিসা ৮৬ আয়াত)*

ইয়াহুদীরা মহানবী ﷺ-কে সালাম দিত; বলত, 'আস্‌সা-মু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! (তোমার উপর মৃত্যু বর্ষণ হোক, হে মুহাম্মাদ!)' 'আস্‌সা-ম' এর অর্থ মৃত্যু। তারা রসূল ﷺকে মৃত্যুর বদ্দুআ দিত। তাই নবী ﷺ বললেন, "ইহুদীরা বলে, 'আস্‌সা-মু আলাইকুম।' সুতরাং ওরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেবে তখন তোমরা তার উত্তরে বল, 'অ আলাইকুম।"

অতএব কোন অমুসলিম যখন মুসলিমকে সালাম দিয়ে বলে, 'আস্‌সা-মু আলাইকুম,' তখন আমরা তার উত্তরে বলব, 'অ আলাইকুম।' উপরন্তু তাঁর উক্তি 'অ আলাইকুম' এই কথার দলীল যে, যদি ওরা 'তোমাদের উপর সালাম' বলে, তাহলে তাদের উপরেও সালাম। সুতরাং ওরা যেমন বলবে আমরাও ওদেরকে তেমনি বলব। এই জন্য কতক উলামা বলেছেন যে, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোন অমুসলিম যখন স্পষ্ট শব্দে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবে তখন আমাদের জন্য 'অ আলাইকুমুস সালাম' বলে উত্তর দেওয়া বৈধ হবে।

১৪। কোন মজলিসে মুসলিম-অমুসলিম এক সাথে বসে থাকলে সেখানেও সালাম দেওয়া সুন্নত। *(বুখারী ৬২৫৪, মুসলিম ১৭৯৮নং দ্রঃ)* অবশ্য এখানে নিয়ত রাখতে হবে মুসলিমদের জন্য। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ১/৩৯০, আযকার, নওবী ৩৬৭পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, মুসলিম-অমুসলিম মিশ্র মজলিসকে লক্ষ্য করে 'আস্‌-সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' বলে সালাম দেওয়া বিধেয় নয়। *(ফাতাওয়াল আকীদাহ, ইবনে উষাইমীন ২৩৭পৃঃ)* পক্ষান্তরে অমুসলিমকে চিঠি লিখার সময় ঐ সালাম লিখা চলে।

১৫। কেবলমাত্র (হাত বা মাথার) ইশারা ও ইঙ্গিতে সালাম বা তার উত্তর দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তা আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) সালাম। *(সহীহ তিরমিযী ২১৬৮নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)* কিন্তু দূরের বা কাঁচের ভিতরের কাউকে, অথবা কোন কালা লোককে, সালাম দিতে হলে হাতের ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ করতে হবে। অবশ্য বোবা ব্যক্তি ইশারায় না দিলে আর কিভাবেই বা সালাম ও তার উত্তর দেবে?

জ্ঞাতব্য যে, সালাম বা তার উত্তর দেওয়ার সময় হাতকে কপালে স্পর্শ করা (স্যালুট করা) বৈধ নয়। কারণ তা বিজাতীয় প্রথা।

১৬। নামাযরত মুসল্লীকেও সালাম দেওয়া বৈধ। অবশ্য মুসল্লী মুখে কিছু না বলে কেবল হাত অথবা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দেবে। *(মুসলিম ৫৪০, আবূ দাঊদ ৯২৫নং)*

১৭। কুরআন পাঠরত ব্যক্তিকেও সালাম দেওয়া বৈধ এবং পাঠকারীর জন্য পাঠ বন্ধ

করে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজেব। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৮৩)*

প্রকাশ থাকে যে, পানাহাররত কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া অবিধেয় বা নিষিদ্ধ অথবা মাকরূহ নয়। যেমন পানাহার করা অবস্থাতেও সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

১৮। প্রস্রাব-পায়খানা করছে এমন লোককে সালাম দেওয়া মাকরূহ। কেননা সে অবস্থায় আল্লাহর যিক্র তথা সালামের উত্তর বৈধ নয়। *(সহীহুল জামে' ৫৭৫নং)* অবশ্য কেউ (অজান্তে) সালাম দিয়ে ফেললে ওযূ করার পর তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। *(আহমাদ ১৮৫৫৫, আবূ দাউদ ১৭, নাসাঈ ৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৫০, দারেমী ২৬৪১নং)*

১৯। স্বগৃহে প্রবেশকালেও সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের (নিজেদের) স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

ঘরে কেউ থাকলে তো বটেই, কেউ না থাকলেও সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। আর সেই সময় বলতে হবে, 'আস্-সালামু আলাইনা অআলা ইবাদিল্লাহিস স্বালিহীন।' *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ১০৫৫নং, ফাতহুল বারী ১১/২২)*

বাড়িতে স্ত্রী-পরিজনকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করায় আপোসে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এর ফলে আল্লাহর যামানত লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি আল্লাহর যামানতে; (১) যে ব্যক্তি জিহাদে বের হয়ে শহীদ হয়ে যায় অথবা সওয়াব ও গনীমতের মাল সহ বাড়ি ফিরে আসে। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে বের হয়ে মারা যায় অথবা সওয়াব সহ ঘরে ফিরে আসে। আর (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে বাড়ি প্রবেশ করে।" *(আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহহুল জামে' ৩০৫৩নং)*

২০। কেউ পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে যে সালাম পৌঁছাবে তাকে সহ সালামদাতাকে এই উত্তর দেওয়া বিধেয়, **وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.**

(অ আলাইকা অ আলাইহিস সালা-ম)। অর্থাৎ, আর আপনার ও তাঁর উপরেও শান্তি বর্ষণ হোক। *(আহমাদ ২২৫৯৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪৩৫৮নং, ফাতহুল বারী ১১/৪১)*

প্রকাশ থাকে যে, উত্তরে সালাম বাহককে সালাম দেওয়া ওয়াজেব নয়, মুস্তাহাব। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ আয়েশাকে জিবরীলের সালাম পৌঁছালে তিনি উত্তরে কেবল 'অআলাইহিস সালাম অরাহমাতুল্লাহ'ই বলেছিলেন। *(বুখারী ৬২৫৩নং)*

আবূ যার্র ؓ-এর উক্তে মতে প্রেরিত সালাম হল নিতান্ত হাল্কা বহনযোগ্য একটি

সুন্দর উপহার। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ১/৩৯৩)*

২১। মসজিদে কেউ থাকলে, কোন হালকাহ বা দর্সের জামাআত থাকলে, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়ে তারপর তাদেরকে সালাম দেওয়া বিধেয়। অবশ্য সামনে কেউ পড়ে গেলে তাকে সালাম দেওয়ার পর নামায পড়া দূষণীয় নয়।

২২। জুমআর খুতবা চলাকালে সালাম ও তার উত্তর দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে, তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআহ) বাতিল করলে।" *(ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৭১৬ নং)*

কিন্তু যদি কেউ সালাম দেয়, তাহলে ইশারায় উত্তর দেওয়া চলে। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৮/২৪৩)* মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালে মুখে কথা না বলে মুসাফাহা করা জায়েয। *(ঐ ৮/২৪৬)* অবশ্য খুতবা শেষে সালামের জবাব দেওয়া যায়।

২৩। কোন প্রকার কথা বলার পূর্বে সালাম দেওয়া বিধেয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে প্রথমে সালাম না দেবে, তাকে (প্রবেশে) অনুমতি দিও না।" *(সহীহুল জামে' ৭১৯০নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে সালামের আগে কথা বলতে শুরু করে, তার (সালামের) জবাব দিও না। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৮১৬নং)*

২৪। যদি কোন লোক হারাম কাজ করছে (যেমন ঃ বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছে অথবা দাড়ি চাঁচছে) তাহলে সেই পাপে রত থাকা অবস্থায় তাকে সালাম দেবেন না। সালাম দেবেন না কোন বেনামাযী অথবা এমন বিদআতীকে যে বিদআতী কাফেরকারী বিদআত করে থাকে। এমন লোকদের সালামের উত্তরও দেবেন না। পক্ষান্তরে সাধারণ পাপী-তাপী মানুষকে সালাম না দিলে যদি দ্বীনের কোন মঙ্গল আছে মনে করেন, তাহলে তাকেও সালাম দেওয়া বর্জন করুন। অবশ্য মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারণ পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে।

২৫। কারণবশতঃ যদি কোন মুসলিম ভায়ের সাথে আপনার সালাম-কালাম বন্ধ থাকে, তাহলে তা ৩ দিনের বেশী বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, নিজ ভাইকে তিন দিনের বেশী (কথাবার্তা, সালাম-কালাম বন্ধ রেখে) বর্জন করা কোন মুসলিম মানুষের জন্য বৈধ নয়; সাক্ষাৎ হলে এও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওও মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এদের মধ্যে উত্তম হল সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়।" *(বুখারী, মুসলিম ২৫৬০নং, আবূ দাউদ প্রমুখ)*

২৬। আসার ও সাক্ষাতের সময় যেমন সালাম সুন্নত, তেমনি যাওয়ার সময় (প্রস্থান ও বিদায়ের সময়)ও সালাম দেওয়া সুন্নত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে গিয়ে পৌঁছবে, তখন সে যেন সালাম দেয়। অতঃপর

যখন সে উঠে আসার ইচ্ছা করে, তখনও সে যেন সালাম দেয়। যেহেতু দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অধিক প্রয়োগযোগ্য নয়।” *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৩৫৬)*

২৭। সালাম দেওয়ার সময় কোন প্রকার ঝুঁকা বৈধ নয়। সালামের পরিবর্তে ‘হেলো’, ‘আহলান’, ‘গুডমর্নিং’ ইত্যাদি বলাও বিজাতীয় প্রথা। সালামের সময় জুতা খুলে, প্রণত হয়ে, ঝুঁকে পা স্পর্শ করে সালাম (প্রণাম) করা, কদমবুসী করা এবং সিজদা করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। এ শ্রেণীর সালাম নেওয়াও বৈধ নয় কোন মুসলিমের জন্য।

অপরের সাথে সাক্ষাতের আদব

কোন মুসলিম ভায়ের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হলে তাকে হাসি মুখে দেখা করুন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।” *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

তিনি আরো বলেন, “কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।” *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

১। সালাম দেওয়ার পর তার সাথে মুসাফাহাহ করুন। যেহেতু এই মুসাফাহার বড় মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে। মুসাফাহার ফলে গোনাহ ঝরে যায় মুসলিমের।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখনই কোন দুই মুমিন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে আপোসে মুসাফাহাহ করে, (কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যের হাত ধরে) তখনই তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩৪৩ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, মুসাফাহাহর সাথে সাথে আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করার হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফ আবু দাউদ ১১১৩, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৩৪৪নং)* সহীহ নয় অন্য কোন দুআ ও দরূদও। অবশ্য কোন কোন সহীহ বর্ণনায় কেবল আল্লাহর প্রশংসা করার কথা পাওয়া যায়। *(সহীহুল জামে’ ২৭৪১নং)* অল্লাহু আ’লাম।

বারা বিন আযেব ﷺ বলেন, ‘পরিপূর্ণ অভিবাদন হল তোমার ভায়ের সাথে তোমার মুসাফাহাহ করা।’ *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৬৭নং)*

আনাস ﷺ বলেন, ‘মুসাফাহাহ সর্বপ্রথম ইয়ামানের লোকেরা চালু করে।’ *(আহমাদ ৩/ ১৫৫, ২২৩, আবূ দাউদ ৫২১৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫২৭নং)*

আসলে মুখে সালাম (শান্তির দুআ) দেওয়ার পর মুসাফাহাহ তারই সত্যায়ন করে। মুসলিমের হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের, মুখের সাথে মুখের এবং কাজের সাথে কাজের মিল একত্রিত হয়। সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনের এটিই হল রশির প্রথম খি (আল)।

২। মুসাফাহাহ হল সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় বিধেয়। অবশ্য মুসাফাহা সাক্ষাতের সময় সুন্নত এবং বিদায়ের সময় মুস্তাহাব। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/ ১/৫৩পৃঃ)*

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ নিজ বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার জন্য কি প্রণত হবে?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "না।" লোকটি বলল, 'তাহলে কি তাকে জড়িয়ে (ধরে মুআনাকা) করবে এবং চুম্বন করবে?' তিনি বললেন, "না।" লোকটি বলল, 'তাহলে কি মুসাফাহা করবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (ইচ্ছা করলে) মুসাফাহাহ করবে।" *(আহমাদ ৩/ ১৯৮, তিরমিযী ২৭২৮, ইবনে মাজাহ ৩৭০২, বাইহাক্বী ৭/ ১০০)*

সুতরাং সাক্ষাৎ (ও বিদায়) ছাড়া অন্য সময়ে তা বিধেয় নয়; বিদআত। যেমন ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর পর ইমাম সাহেব অথবা ডান ও বাম পাশের নামাযীর সাথে মুসাফাহাহ করা বিদআত। *(শারহুল আদাবিল মুফরাদ ২/ ৪৩০-৪৩১)*

যেমন ঈদের নামাযের পর (খাস ঈদের জন্য) মুসাফাহাহ ও মুআনাকা বিদআত। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪২৭, আউনুল মা'বূদ ১৪/৮২)*

অবশ্য কেউ নামাযে শামিল হওয়ার পূর্বে সালাম-মুসাফাহাহ করার সুযোগ না পেয়ে যদি নামাযের পর তা করে, তাহলে তা প্রথম সাক্ষাতের সালাম-মুসাফাহাহ, বিধায় তা বিদআত নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৫৩)*

৩। শিশুর সাথেও মুসাফাহাহ করুন এবং সেই সাথে তার মাথায় হাত বুলান। বিশেষ করে এতীমের মাথায় হাত বুলালে হৃদয়ের কঠোরতা দূর হয়ে যায়।

৪। কোন এমন (বেগানা) কিশোরী বা মহিলার সাথে মুসাফাহাহ বৈধ নয়, যার সাথে কোনও কালে আপনার বিবাহ বৈধ। ছোট থেকে যাদেরকে হয়তো আপনি কোলে-পিঠে মানুষও করেছেন এবং খালি গায়েও দেখেছেন তারা বড় হওয়ার পর ইসলামী বিধানে আপনার নিকট থেকে দূর হয়ে যাবে। যেমন চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো বোন, শালী ইত্যাদির সাথেও মুসাফাহাহ হারাম। আপনার শ্রদ্ধেয়া, আপনার চেয়ে অনেক বড় হলেও, আপনি তাকে মায়ের তুল্য মনে করলেও নিয়ত ভালো রেখেও ইসলামী বিধানে তার সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ ও মুসাফাহাহ বৈধ নয়। আসলে কেবল মনে করে নেওয়ার ফলে কেউ কারো বোন বা মা হয়ে যায় না। যেমন কেবল মনে করার ফলে কেউ কারো স্ত্রী হতে পারে না। অর্থাৎ, যেমন কোন মহিলাকে স্ত্রী

জ্ঞান করে তার সাথে স্ত্রীরূপ ব্যবহার করা যাবে না, ঠিক তেমনিই কাউকে আপন মা মেয়ে, বা বোন জ্ঞান করে মা, মেয়ে বা বোনের মত ব্যবহার ও দেখা-সাক্ষাৎ, উঠা-বসা ও সালাম-মুসাফাহাহ বৈধ হতে পারে না। অতএব ভাবী, চাচী, মামী, স্ত্রীর বড় বোন ইত্যাদিদেরকে আপনি আপন মা বা বোন ভাবুন। কিন্তু সেই ভাবাতে তাদের সাথে আপনার মুসাফাহাহ বৈধ হবে না। আপনার শিষ্য বা ছাত্রীকে নিজের মেয়ে ভাবুন, কিন্তু সে জন্য তার সাথে আপনার মুসাফাহাহ বৈধ নয়।

অনুরূপ কোন মহিলাও পারে না কোন বেগানা পুরুষ বা কিশোরের সাথে মুসাফাহাহ করতে। যদিও সে তাকে আপন বাপ, ছেলে বা ভাই মনে করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বায়আত করার সময়ও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেননি। প্রত্যেক (বেগানা) মহিলার সাথে তিনি কথা দ্বারা বায়আত করেছেন। *(বুখারী ৫২৮৮নং)* তিনি বলেছেন, "আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহাহ করি না।" *(আহমাদ ২৬৪৬৬, তিরমিযী ১৫৯৭, নাসাঈ ৪১৮১, ইবনে মাজাহ ২৮৭৪, মালেক ১৮৪২নং)*

মহানবী ﷺ কাপড়ের উপর থেকে মহিলাদের সাথে মুসাফাহাহ করতেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২/৫৩)* অতএব শাড়ি, ওড়না বা হ্যান্ডকভারের পর্দার উপর থেকেও কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহাহ বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন বুড়ির সাথেও মুসাফাহাহ করা।

৫। মুসাফাহাহ করার সময় সাথীর হাত থেকে আপনি আগে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার সাথে লম্বা সময় ধরে হাতে হাত দিয়ে রাখুন। যখন সাথী হাত ছেড়ে দেবে, তখন আপনিও ছেড়ে দিন।

মহানবী ﷺ এরূপই করতেন। *(তিরমিযী ২৪৯০, ইবনে ৩৭১৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৮৫নং)*

অবশ্য এই সুন্নত পালন করতে আগ্রহী উভয়েই যদি হাত না ছাড়তে চায়, তাহলে সময় বেশী লম্বা হলে আপনি না ছাড়লে আর করবেনই বা কি?

৬। মুসাফাহাহ মানে হল, দুইজনের মুখোমুখী হয়ে নিজ নিজ ডান হাতের (করতলের) সাথে হাত (করতল) মিলিয়ে ধারণ করা।

মুসাফাহাহ মানে করমর্দন নয়। করমর্দন হল, দুইজনের প্রীতিসম্ভাষণার্থ পরস্পরের হাতঝাঁকুনি, যাকে ইংরেজীতে হ্যান্ডশেইক বলা হয়। আর ইসলামী মুসাফাহাতে হাতের ঝাঁকুনি নেই, মর্দন, দলন বা পেষণ নেই।

৭। মুসাফাহাহ এক হাতে এবং কেবল ডান হাতে।

আরবী অভিধানে বলা হয়েছে, মুসাফাহাহ হল অপরের হাত ধরা। *(আল-কামূসুল মুহীত্ব ১/২৯২)* একটি লোকের সাথে অপর লোকের মুসাফাহাহ করার অর্থ হল,

একজনের করতলকে অপরের করতলে রাখা। সাক্ষাতের সময় মুসাফাহাহ হল, দুইজনের মুখোমুখী হয়ে নিজ নিজ হাতের (করতলের) সাথে হাত (করতল) মিলিয়ে ধারণ করা। *(লিসানুল আরাব ২/৫১৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই দুইজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে ওদের মধ্যে একজন অপরজনকে সালাম দিয়ে তার হস্ত ধারণ করে (মুসাফাহাহ করে), আর তার হস্ত ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়, তখনই তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫৭৭৮-নং)*

৮। আগন্তুকের জন্য উঠে দাঁড়ানো

আগন্তুকের তা'যীমে উঠে খাড়া হওয়া বিধেয় নয়।

আবূ উমামাহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা'যীমে উঠে দাঁড়ায়।" *(আবূ দাউদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

আনাস বিন মালেক ؓ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।" *(সহীহ, আহমদ ও তিরমিযী)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

অবশ্য প্রয়োজনে আগন্তুককে সাহায্য করতে, তার সাথে মুআনাকা করতে, তাকে নিজের জায়গায় বসাতে উঠে দাঁড়ানো বৈধ।

রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। *(আবূ দাউদ ৫২১৭, তিরমিযী ৩৮৭২নং)*

(খন্দকের যুদ্ধ শেষে) সা'দ ؓ আহত ছিলেন। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ তাঁকে আহূত করেন। তাই তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন রসূল ﷺ আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ এবং ওঁকে নামাও।" সুতরাং (কিছু) সাহাবা উঠে গিয়ে

তাঁকে গর্দভ থেকে নামালেন। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭নং)*

এই দন্ডায়মান আনসারের সর্দার সা'দ ﷺ-এর সাহায্যার্থে বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তিনি গর্দভের পৃষ্ঠে আহতাবস্থায় বসে ছিলেন; যাতে (নামতে গিয়ে) পড়ে না যান। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ এবং অবশিষ্ট সাহাবাবৃন্দ উঠে দন্ডায়মান হননি।

সাহাবী কা'ব বিন মালেক যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার পর তাঁর তওবা কবুল হওয়ার শুভসংবাদ নিয়ে তালহা তাঁর প্রতি উঠে ছুটে পৌঁছলেন। *(আহমাদ ৩৪৫৬নং, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

সুতরাং কোন দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে আনন্দ আনয়ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করার উদ্দেশ্যে উঠে দন্ডায়মান হয়ে তার নিকট যাওয়া বৈধ ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, মুসাফাহার পর বুকে হাত বুলানো বা মুখে নিয়ে চুমা দেওয়া বিদআত। যেমন কোন গুরুজনের সাক্ষাতে পায়ের জুতা খোলাও অতিরঞ্জিত বিদআত।

৯। সফর থেকে ফিরে সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে মুআনাকা করা বিধেয়।

আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ যখন আপোসে সাক্ষাৎ করতেন, তখন মুসাফাহাহ করতেন এবং যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন মুআনাকা করতেন।' *(ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৩৬)*

ইমাম শা'বী বলেন, 'নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ যখন আপোসে সাক্ষাৎ করতেন, তখন মুসাফাহাহ করতেন এবং যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন একে অপরের সাথে মুআনাকা করতেন।' *(বাইহাক্বী ৭/১০০)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে খবর এল যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনেছে। সুতরাং আমি একটি উঁট ক্রয় করে সফরের সামান বেঁধে এক মাস যাবৎ রাস্তা চলে তার নিকট শাম দেশে পৌঁছলাম! দেখলাম সে লোক ছিল আব্দুল্লাহ বিন উনাইস। আমি দারোয়ানকে বললাম, ওঁকে বল, দরজায় জাবের অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পরনের কাপড় পায়ে দলতে দলতেই বের হয়ে এসে আমার সাথে মুআনাকা করলেন, আমিও তাঁর সাথে মুআনাকা করলাম। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৭০নং, আহমাদ ৩/৪৯৫)*

মহানবী ﷺ ইবনে তাইয়িহানের কাছে এলে ইবনে তাইয়িহান মহানবী ﷺ-এর সাথে মুআনাকা করেছিলেন। *(মুখতাসার শামায়েল ১১৩নং)*

অবশ্য এই মুআনাকা সফর থেকে ফিরে এসে না হলেও অতিরিক্ত সাক্ষাৎ-

আকাঙ্ক্ষার কারণে করেছিলেন। তাছাড়া প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় মুআনাকা করতে খোদ আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬০নং, মুখতাসার শামায়েল ৭৯পৃঃ, টীকা)*

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঈদের নামাযের পর (খাস ঈদের জন্য) মুসাফাহাহ ও মুআনাকা বিদআত। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪২৭, আউনুল মাবূদ ১৪/৮২)*

১০। মুআনাকা হল, অপরের উনুক (গর্দানের) সাথে উনুক (গর্দান) লাগিয়ে জড়িয়ে ধরা। *(লিসানুল আরাব ১০/২৭২)* বুকে বুক লাগাবার কথা নেই। অবশ্য কোন কোন অভিধানে গর্দানের সাথে গর্দান লাগিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার কথাও রয়েছে। *(আল-মু'জামুল অসীত্ব ৬৩২পৃঃ)* কোন কোন অভিধানে রয়েছে, অপরের গর্দানে দুই হাত রেখে নিজের দিকে টেনে নেওয়া। *(মুখতারুস সিহাহ ১৯২পৃঃ)*

সুতরাং বুঝা যায় যে, এই আদবের মূল হল, গর্দানের সাথে গর্দান মিলানো। অবশ্য অত্যন্ত ভালোবাসার আকর্ষণে বুকে জড়িয়ে ধরা দোষাবহ নয়। তবে গর্দান পরিবর্তন করার কথা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে ডানে-বামে পরিবর্তন করে তিনবার গলাগলি করা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত নয় তথা তা দলীল-সাপেক্ষ্য।

মুআনাকার অর্থে বাংলাতে কোলাকুলি ব্যবহার করা হয়। আর সে ক্ষেত্রে বুকে বুক ও পেটে পেট লাগিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে অনেকে মহব্বতের আকর্ষণে। আর সেই জন্য অনেকে এটাকে আশ্লেষ বা আলিঙ্গনও বলে থাকে।

তবে এ শব্দ কেবল স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। কারণ, এর গভীর অর্থ হল, লিঙ্গ পর্যন্ত কোলাকুলি করা বা বুকে জড়িয়ে ধরা। অতএব অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঐ শব্দ ব্যবহার করা বৈধ নয়।

১১। সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে (গালে) চুম্বন দেওয়া বিধেয় নয়। বরং তা নিষিদ্ধ; যেমন পূর্বের এক হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে স্ত্রী ও শিশু-সন্তানকে চুম্বন দেওয়ার কথা স্বতন্ত্র। কারণ তাদেরকে প্রেম ও স্নেহভরে যে কোন সময় দেওয়া বৈধ।

দুই চোখের মাঝে কপাল চুম্বন দেওয়া বৈধ। জাফর হাবশা থেকে ফিরে এলে মহানবী ﷺ তাঁর সাথে মুআনাকা করে তাঁর দুই চোখের মাঝে (কপালে) চুম্বন দিয়েছিলেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/ ১/৩৩৮)*

যেমন কিছু শর্তের সাথে আলেম (পিতা-মাতা বা গুরুজন)দের হাতে বুসা দেওয়া বৈধ।

(ক) শ্রদ্ধাস্পদ যেন গর্বভরে হাত প্রসারিত না করে।

(খ) শ্রদ্ধাকারীর মনে যেন তাবার্রুক বা বর্কত নেওয়ার খেয়াল না থাকে।

(গ) বুসা দেওয়া বা নেওয়াটা যেন কোন প্রথা বা অভ্যাসে পরিণত না হয়।
(ঘ) ওর স্থলে যেন মুসাফাহা পরিত্যক্ত না হয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৩০২)*
(ঙ) বুসার সময় হাতকে নিয়ে কপালে যেন স্পর্শ না করা হয়।

১২। সতর্কতার বিষয় যে, এ কথা পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, সালামের সময় কোন প্রকার ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া বৈধ নয়, বৈধ নয় কারো জন্য কোন প্রকার (তা'যীমী) সিজদাহ।

আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ﷺ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একি মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।' তা শুনে তিনি ﷺ বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! মহিলা তার প্রতিপালক (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না।) এমন কি সে যদি (সফরের জন্য) কোন বাহনে আরোহিণী থাকে, আর সেই অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর 'না' বলার অধিকার নেই।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১ নং, হাকেম ৪/১৭২, বায্যার ১৪৬১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

তদনুরূপ বৈধ নয় অমুসলিমদের প্রণাম; নত হয়ে ঝুঁকে বড়দের পা স্পর্শ করে বুকে-কপালে ঠেকানোর সালাম।

জ্ঞাতব্য যে, সাক্ষাতের পর পৃথক হওয়ার পূর্বে সূরা আস্‌র পড়া অতঃপর সালাম দিয়ে বিদায় হওয়া উত্তম। *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৪৮নং)*

কাউকে দেখা করতে যাওয়ার আদব

বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কোন দ্বীনী ভাইকে দেখা করতে যাওয়ার বড় গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। এমন যিয়ারতের সওয়াবও রয়েছে বড়। অবশ্য সে যিয়ারত কিন্তু কোন স্বার্থের খাতিরে হলে হবে না; বরং তা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

এমনিতেই এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। একজন অপর জনের জন্য আয়না স্বরূপ। মুসলিম সমাজ একটি দেহের মত। যার একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে সারা দেহ সেই ব্যথা অনুভব করে। অতএব আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে দেখা করতে যাওয়া, দ্বীনী কোন বিষয় জানার জন্য, পরস্পরকে হক ও সবরের অসিয়ত ও নসীহত করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার ব্যাপারে সহযোগিতার পথ খোঁজার জন্য যিয়ারত করতে যাওয়ার গুরুত্ব অবশ্যই আছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য এক বস্তিতে তার এক (দ্বীনী) ভায়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তাআলা তার গমন-পথে একজন অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা বসিয়ে দিলেন। (লোকটি সেখানে পৌঁছলে) ফিরিশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ?' সে বলল, 'ঐ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কাছে তোমার কোন সম্পদ আছে কি; যার দেখাশোনা করার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালোবাসি, তাই যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা বললেন, 'আমি আল্লাহর নিকট হতে তোমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে ভালোবাস।" *(মুসলিম)*

তবে লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পালনীয় বিভিন্ন আদব রয়েছে; যা নিম্নরূপ ঃ-

১। সাক্ষাতের যে নিষিদ্ধ সময় রয়েছে, সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হন।

কুরআন কারীমে তিন সময়ে নিজেদের খাদেম ও নাবালক শিশু-সন্তানদেরকেও খাস কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তারা ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরের সময় এবং এশার নামাযের পরে কাছে আসতে চাইলে আগেই অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। যেহেতু এই তিন সময় সাধারণতঃ বাহ্যিক লেবাস খুলে রাখার সময়, ঘুম ও আরামের সময়, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপ ও মিলনের সময়।

ঘরের লোকের জন্য যদি এই নিয়ম হয়, তাহলে বাহির থেকে অন্য লোকের জন্য অবশ্যই সে নিয়ম অধিক মান্য হবে। কেননা, তা পালন না করলে এবং ঠিক ঐ তিন সময়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলে যাকে দেখা করার উদ্দেশ্যে যাবেন, তার ও তার বাড়ির লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটবে, তাদের আরাম ব্যায়রামে পরিণত হবে, বহু অসুবিধা ও বাধা সৃষ্টি হবে তাদের সাংসারিক কাজ-কর্মেও। আর এ সময়গুলিতে সাধারণতঃ কেউই চায় না যে, তার কাছে অন্য কেউ আসুক।

অবশ্য দূরের মেহমান অথবা আহূত অতিথি অথবা দুপুর বা রাতের খানার দাওয়াতপ্রাপ্ত কেউ হলে সে কথা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে বাড়ির লোককেও কষ্ট স্বীকার করে নিতে হয় এবং সবাই তাতে সওয়াবও পায়।

মহানবী ﷺ আবূ বাক্‌রের বাড়ি প্রায় সকাল অথবা সন্ধ্যায় যাতায়াত করতেন। হিজরতের সময় যখন তিনি যোহরের সময় আবূ বাক্‌রের কাছে এলেন, তখন আবূ বাক্‌র বুঝলেন যে, নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটেছে। *(বুখারী ২ ১৩৮, আবূ দাউদ ৪০৮৩নং)* আর তাঁর এই বুঝা এই কথারই দলীল যে, যোহরের সময় দেখা-সাক্ষাৎ করার সময় নয়।

ইল্‌ম-পিয়াসী ইবনে আব্বাস বলেন, 'যখন আমার কাছে কোন লোকের হাদীস পৌঁছত, আমি তার নিকট এসে উপস্থিত হতাম। আর সেই (দুপুরের) সময় সে যদি আরাম করত, তাহলে আমি তার দরজায় নিজ চাদরকে বালিশ বানিয়ে বসে যেতাম। আর বাতাস এসে আমার মুখে মাটি ছড়িয়ে দিত! *(দারেমী ৫৭০নং)*

২। আপনি যাকে দেখা করতে যাচ্ছেন, সে যদি আপনার থেকে জ্ঞানে-মানে ছোটও হয়, তবুও আপনি নিজ থেকে তার ইমামতির জায়গায় ইমামতি করবেন না এবং তার আসনে বা বিছানায় বসবেন না। অবশ্য সে অনুমতি দিলে বা অনুরোধ করলে আলাদা কথা।

মহানবী ﷺ বলেন, "--- আর কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে ইমামতি না করে এবং না কেউ কারো ঘরে তার বসার জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে বসে।" *(আহমাদ ৪/ ১১৮, মুসলিম ৬৭৩, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১১১৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “যখন তোমাদের কেউ কোন সম্প্রদায়ের যিয়ারতে যায়, তখন সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্যেই কেউ যেন ইমামতি করে।” *(সহীহুল জামে’ ৫৮৪নং)*

৩। কোন ওস্তায, বন্ধু বা দ্বীনী ভাইকে সাক্ষাৎ করতে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করুন। অবহেলা ও অতিরঞ্জন বর্জন করে মাঝে মাঝে তার যিয়ারত করুন। যাতে আপনাদের মাঝে মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং কারো মনে বিরক্তি সঞ্চার না হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “(প্রত্যেক দিন সাক্ষাৎ না করে) একদিন বাদ পরদিন সাক্ষাৎ কর। তাতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।” *(বাযযার, ত্বাবারানী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৩৫৬৮ নং)*

রোগীকে সাক্ষাৎ করার আদব

ইসলাম দয়া-দাক্ষিণ্য ও রহমতের ধর্ম। সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রাখতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। মানুষের বিপদে সহযোগিতা করতে এবং আপদে সান্ত্বনা দিতে অনুপ্রাণিত করেন আমাদের রহমতের নবী ﷺ।

রোগীকে দেখা করে সান্ত্বনা দেওয়া সেই ইসলামী আদবের অন্যতম। বরং একজন রোগগ্রস্ত মুসলিম ভায়ের এটি একটি প্রাপ্য অধিকার।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাবে ‘য়্যারহামুকাল্লাহ’ বলা।” *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২নং)*

রোগীকে সাক্ষাৎ করলে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং তার প্রতিদান পাওয়া যায় সঙ্কটময় দিন কিয়ামতে।

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমাকে সাক্ষাৎ করনি!’ মানুষ বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনার (অসুস্থতা ও) সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল, কারণ আপনি তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তাকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে সাক্ষাৎ করতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে?’

(আল্লাহ আরো বলবেন,) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অন্নদান করনি!' মানুষ বলবে, 'হে প্রভু! কেমন করে আপনাকে অন্নদান করতাম? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিল? কিন্তু তুমি তাকে অন্ন দান করনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে অন্ন দান করে থাকতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?'

(আল্লাহ আরো বলবেন,) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি!' মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পিপাসায় পানি ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?" *(মুসলিম ২৫৬৯ নং)*

আর সাক্ষাৎকারী মুসলিম ভায়ের রয়েছে বড় সওয়াব।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখনই তার সাথে ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সাথে ও ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৭১৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল তুলতে থাকে।" *(আহমাদ ২ ১৮৬৮, মুসলিম ২৫৬৮, তিরমিযী ৯৬৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে আসলে রহমতে বিচরণ করতে থাকে। অতঃপর সে যখন (রোগীর নিকটে) বসে যায়, তখন রহমতে স্থায়ী হয়ে যায়।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫২২নং)*

রোগীকে সাক্ষাত করার ব্যাপারে নিম্নের আদব খেয়াল রাখুনঃ-

১। রোগী শিশু হলেও তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সান্ত্বনা দিন।

২। নারী-পুরুষ পরস্পরকে রোগে সান্ত্বনা দিতে পারে। অবশ্য বেগানা হলে পর্দা ও ফিতনা দূর হওয়ার শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। আল্লাহর নবী ﷺ বেগানা মহিলা রোগীর সাথে দেখা করে সান্ত্বনা দিয়েছেন। *(মুঅত্ত্বা ৫৩ ১নং)* অনুরূপ মদীনায় হিজরতের পর সাহাবাগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে মা আয়েশা সাহাবী বিলালের কাছে গিয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। *(বুখারী ৫৬৫৪, মুসলিম ১৩৭৬নং)*

৩। রোগী বেহুশ ও অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং আপনাকে চিনতে না পারলেও তাকে দেখা করতে যান। সান্ত্বনা দিতে না পারলেও আপনি তার জন্য দুআ করবেন। তাতেও আপনার সওয়াব হবে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মন ডাগর হবে।

৪। রোগী অমুসলিম হলেও তাকে দেখতে যান। আল্লাহর নবী ﷺ অমুসলিম রোগীর সাথে দেখা করে তার বাঁচার পথ বলেছেন। *(বুখারী ৫৬৫৭, ৬৬৮১, মুসলিম ২৪নং)*

৫। রোগীকে এমন সময় দেখতে যান, যে সময় দেখতে গেলে তার এবং তার পরিবারের যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। যেহেতু রোগী দেখতে যাওয়ার মানে তার ও তার পরিজনের মনকে সান্ত্বনিত করতে যাওয়া। সুতরাং অসময়ে গিয়ে তাদেরকে বিরক্ত করলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। রোগীর আরাম বা ঘুমের সময়, খাওয়া বা নামাযের সময় সাক্ষাৎ করতে যাওয়া উচিত নয়।

৬। রোগী দেখতে গিয়ে তার কাছে লম্বা সময় ধরে বসে থেকে তাকে বিরক্ত করেন না। সে যদি নিজের রোগ-যন্ত্রণা নিয়ে ছট্‌ফট্‌ করে তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করেই চট্‌ করে ফিরে আসেন। অবশ্য রোগী যদি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পাশে পেয়ে সান্ত্বনা পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় থাকাতে দোষ নেই। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ﷺগণ তাঁদের অসুস্থতার সময় তাঁদের প্রাণপ্রিয় নবী ﷺ-কে দীর্ঘক্ষণ কাছে দেখতে চাইতেন।

৭। রোগী দেখতে গিয়ে তার মাথার নিকট বসা সুন্নত। মহানবী ﷺ এক ইয়াহুদী কিশোরকে দেখতে গিয়ে তার মাথার নিকট বসেছিলেন। *(বুখারী)* ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তার শিথানে বসতেন।' *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৩৬নং)*

৮। রোগী দেখতে গিয়ে কি বলবেন?

রোগী দেখতে গিয়ে তার সামনে এমন কথা বলবেন না, যা শুনে সে আতঙ্কিত হয়, ঘাবড়ে যায়, তার রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা তার মৃত্যু অনিবার্য মনে করে এবং মরণ আসার পূর্বেই সে জীবনের হাল ছেড়ে বসে। বরং এমন কথা বলবেন, যাতে সে পীড়িত মনে সান্ত্বনা পায়। শেষ অবস্থায় হলে মনের ভিতর যেন কোন প্রকার নিরাশা না আসে।

তাকে বলুন, 'আপনি ভালো হয়ে যাবেন ইন শাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। এ রোগের জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। ---' ইত্যাদি।

আর খবরদার তার নিকট বলবেন না, 'এ রোগের কোন ওষুধ নেই। এ রোগে মানুষ বাঁচে না। এ রোগ কঠিন রোগ। আপনি আর বাঁচবেন না। আপনি আপনার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যান। ভালো-মন্দ যা খাবার খেয়ে নিন।---' ইত্যাদি।

আপনি ডাক্তার হয়ে যদি কোন উপসর্গ দেখে বুঝতে পারেন যে, সে আর বাঁচবে না, তবুও তা গায়বী খবর। সে খবর কাউকে বলবেন না। সুনিশ্চিত হলে অনর্থক খরচের হাত থেকে রোগীর আত্মীয়কে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সে খবর রোগীকে না বলে তার আত্মীয়কেই বলুন, রোগীকে বলবেন না।

রোগ তো হতেই পারে। আল্লাহর নবী ﷺ খোদ কত রোগ ভুগেছেন। কিন্তু রোগে মুমিনের গোনাহ ঝরে, মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। এসব কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮ নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পরিপূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।

অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এইভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!” *(আহমদ, সহীহ আবু দাঊদ ২৬৪৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন (তাদের মঙ্গল চান), তখন তাদেরকে বিপন্ন করেন।” *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৭০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, “মু’মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।” *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

সেই সাথে এ কথাও বলুন ঃ- **لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.**

উচ্চারণঃ- লা বা’সা ত্বাহূরুন ইনশা-আল্লাহ। *(বুখারী ১০/১১৮)*

অর্থ- কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান।

এর অর্থ রোগীকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দিন। রোগী মনে সান্ত্বনা পাবে। পীড়ার কষ্টকে হাল্কা মনে করবে।

রোগীর সাথে কথা বলতে দাওয়াতের সুযোগ নিন। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করে নেওয়ার অসিয়ত করুন। তাকে আল্লাহভীতি প্রদর্শন করুন। এই সময় তার মন ভয়ে ভীত থাকে, কষ্টে আযাবের ভয় থাকে। এই জন্য এই সময় সে আপনার নসীহত গ্রহণ করতে পারে। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, রোগদাতা ও রোগের মুক্তিদাতা আল্লাহই। তাঁর কাছে দুআ করলে তিনি আরোগ্য দান করবেন। কিন্তু তার সাথে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত তো করতে হবে। আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে।

তাকে সান্ত্বনা দিন, তার মনকে শক্ত করুন। ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিন। কষ্টে যেন অধৈর্য না হয় এবং অসমীচীন মন্তব্য না করে, আল্লাহ ও তার তকদীরের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ অভিযোগ না করে বসে।

তার কি প্রয়োজন, কি কষ্ট, কি আশা ও আকাঙ্ক্ষা তা জিজ্ঞাসা করুন। তার রোগ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করুন। তার অবস্থা দর্শন করে আপনি নিজে উপদেশ গ্রহণ করুন।

আর খবরদার তাকে দেখা করতে গিয়ে তার সামনে অট্টহাসি হাসবেন না, অপরের সাথে হাসাহাসি, মজাক-ঠাট্টা ও বাজে কথা বলাবলি করবেন না। কারণ পীড়িত মনে সে কষ্ট পেতে পারে। অন্যথা যদি সে আপনার হাসি ও মজাকে আনন্দ পায়, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

৯। রোগীর নিকট রোগীর জন্য বিশেষ দুআ করুন ঃ-

নবী ﷺ বলেছেন, “মৃত্যু উপস্থিত হয়নি এমন রোগীকে সাক্ষাৎ করে ৭ বার নিম্নের দুআ বললে, আল্লাহ ঐ রোগ থেকে ঐ রোগীকে নিরাপত্তা দান করেন;

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيْمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ.

উচ্চারণঃ- আসআলুল্লা-হাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক্।”

অর্থাৎ, আমি মহান আল্লাহ, মহা আরশের অধিপতির নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমাকে (এই রোগ হতে) নিরাময় করুন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান হাকেম, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৩ নং)*

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ فُلَانًا يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাশফি আবদাকা ফুলানাঁই য়্যানকা’ লাকা আদুউওয়ান আউ য়্যামশী লাকা ইলাস স্বালাহ।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি অমুককে আরোগ্য দান কর, সে তোমার জন্য কোন দুশমন ধ্বংস করবে অথবা তোমার জন্য নামাযে যাবে। *(হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬৮ ১নং)*

আরো অন্যান্য দুআ ‘দুআ ও যিক্‌র’ পুস্তিকায় দেখুন।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের অনেকেই রোগী দেখতে গিয়ে সঙ্গে পুষ্পস্তবক নিয়ে যায়। তার সাথে কার্ডের উপর রোগমুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন মুবারকবাদের বাক্য লিখা থাকে। আর তাই রোগীকে উপহার স্বরূপ পেশ করে থাকে। এমন লোকেরা হয়তো কোন দুআ জানেই না। এমন লোকেরা মুসলিম হয়েও ইসলামের অনুসরণ না করে বিজাতির অনুকরণ করে থাকে। অথচ ওদের অনেকেই হয়তো নামাযে বলে থাকে, ‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ যাল্লীন।’ কিন্তু তোতা যা বলে, তা কি বোঝে?

১০। কাউকে কুশলবাদ জিজ্ঞাসা করলে, রোগী হলেও তাকে সর্বাবস্থায় (আল-হামদু লিল্লাহ বলে) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

একদা শাদ্দাদ বিন আউস ও সুনাবিহী এক রোগীকে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজ সকালে তুমি কেমন আছ?’ লোকটি বলল, ‘(আল্লাহর) নিয়ামতে আছি।’ শাদ্দাদ বললেন, ‘পাপসমূহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং গোনাহসমূহ ঝরে যাওয়ার সুসংবাদ নাও। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, “আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে (রোগ-বালা দিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে ঐ রোগ-বালাতে আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার ঐ বিছানা থেকে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ওঠে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।” রব্ব তাবারাকা অতাআলা (কিরামান কাতেবীনকে) বলেন, “আমি

আমার বান্দাকে (অনেক আমল থেকে) বিরত রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তার জন্য সেই আমলের সওয়াব লিখতে থাক, যে আমলের সওয়াব তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।” *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৩৪২৩নং)*

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আজ সকালে তুমি কেমন আছ হে অমুক?” লোকটি বলল, ‘আমি আপনার নিকট আল্লাহর প্রশংসা করি হে আল্লাহর রসূল!’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “আমি তোমার নিকট থেকে এটাই চেয়েছিলাম।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৫২নং)*

১১। রোগী দেখতে গিয়ে সঙ্গে খাবার নিয়ে গিয়ে কোন খাবার খেতে রোগীকে বাধ্য করবেন না। বরং পথ্য-অপথ্য বুঝে রোগীকে তার পছন্দমত খাবার দিন। যে খাবারে তার ক্ষতির আশঙ্কা আছে সে খাবার তাকে খেতে দেবেন না। রোগী খেতে না চাইলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। খাওয়ার জন্য তার সাথে কোন প্রকার জোর করাও উচিত নয়। তার হায়াত থাকলে রোগদাতা তাকে গায়বীভাবে খাইয়ে থাকেন।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য বাধ্য করো না। যেহেতু (তারা না খেলেও) মহান আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করিয়ে থাকেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭৪৩৯নং)*

১২। রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হলে নিম্নের কাজগুলি করা উচিত ঃ-

(ক) কলেমা ‘**লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ**’ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তিকে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ স্মরণ করিয়ে দাও।” *(মুসলিম ৯১৬, তিরমিযী ৯৭৬, নাসাঈ ১৮২৬, আবু দাঊদ ৩১১৭, প্রমুখ)*

(খ) মুমূর্ষুর জন্য দুআ করা; আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ! ওর মরণকষ্ট আসান করে দাও ---’ ইত্যাদি।

(গ) কোন প্রকারের মন্দ কথা বা অন্যায় মন্তব্য না করা। কারণ, নবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা কোন রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন ভালো কথাই বলো। কেননা, তোমরা যা বলবে তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ ‘আমীন-আমীন’ বলবেন।” *(মুসলিম, তিরমিযী, প্রমুখ)* সুতরাং এ মুহূর্তে দুআ ও বদ্দুআ উভয়ই কবুল হওয়ার আশা ও আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) তার চক্ষুদ্বয় খোলা থাকলে বন্ধ করে দেওয়া এবং তার জন্য পুনঃপুনঃ দুআ করা। যেমন, ‘আল্লাহ ! তুমি ওকে ক্ষমা কর, সৎপথপ্রাপ্ত লোকেদের দলভুক্ত কর এবং ওকে মাফ করে দাও প্রভু! ওর মত (ভালো লোক) ওর বংশে পুনঃ দান কর। আমাদেরকে এবং ওকে মাফ করে দাও প্রভু! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং তা আলোময় করে দিও---।” ইত্যাদি।

উম্মে সালামাহ ﵂ বলেন, নবী ﷺ আবু সালামার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তার চক্ষু (মৃত্যুর পর) খোলা ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, “রূহ কবয হয়ে গেলে চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।” নবী ﷺ বললেন, “তোমরা নিজেদের উপর বদ্দুআ করো না। বরং মঙ্গলের দুআ কর। কারণ, তোমরা যা বল তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ ‘আমীন-আমীন’ (কবুল কর) বলে থাকেন।”

অতঃপর তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাহকে ক্ষমা করে দাও। ওর মর্যাদা উন্নীত করে ওকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করে দাও। ওর অবশিষ্ট পরিজনের মধ্যে ওর প্রতিনিধি প্রদান কর। আমাদেরকে এবং ওকে মাফ করে দাও হে সারা জাহানের প্রভু! ওর জন্য ওর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও।” *(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ৬/২৯৭, বাইহাকী ৩/৩৩৪)*

(ঙ) মুখগহ্বর খোলা থাকলে বন্ধ করে দিন। প্রয়োজনে দুই চিবুক চেপে কিছু বেঁধে দিন। হাত-পা হিলিয়ে ঢিলা করে দিন। অনিবার্য কারণে দাফন-কার্যে দেরী হবে আশঙ্কা করলে লাশ ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করুন।

(চ) একটি চাদর বা কাঁথা দ্বারা তার সর্বশরীর ঢেকে দিন। মা আয়েশা ﵂ বলেন, “আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁকে চেককাটা ইয়ামানী চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।” *(বুখারী, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

মেহমান নেওয়াযীর আদব

বাহির থেকে যে লোক আপনার সাক্ষাৎ বা সাহায্য কামনা করে আপনার কাছে আসে, সে বহিরাগত অতিথি আপনার মেহমান। যাকে যিয়াফত অথবা দাওয়াত দিয়ে আপনি আপ্যায়ন করতে চান সেও আপনার মেহমান। আর আপনি হবেন মেযবান; বলা বাহুল্য, আপনার জন্য মেহমান-নেওয়াযী অর্থাৎ মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(মুসলিম ৪৮নং)*

ইসলামে মেযবান ও মেহমানের পৃথক পৃথক পালনীয় বিভিন্ন আদব রয়েছে; যা নিম্নরূপ ঃ-

১। দাওয়াত কবুল করা ওয়াজেব।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে; সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াবে (আলহামদু লিল্লাহ বলা শুনলে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৮০নং, মুসলিম ২ ১৬২নং)*

মহানবী ﷺ রোযা অবস্থায় থাকলেও বিবাহ ও অন্যান্য দাওয়াতে উপস্থিত হতেন। *(বুখারী ৫ ১৭৯, মুসলিম ১৪২৯ প্রমুখ)*

বলা বাহুল্য, অলীমার জন্য আমন্ত্রিত হলে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে এমন ভোজে উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য। *(বুখারী, মুসলিম)* এমন কি রোযা রেখে থাকলেও উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য দুআ করতে হবে। *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ)* অতএব খেতে বাধা থাকলেও উপস্থিত হওয়া জরুরী।

অবশ্য দাওয়াতে হাযির হওয়া ওয়াজেব পালনের জন্য শর্ত রয়েছে। যেমনঃ-

(ক) দাওয়াতদাতা যেন এমন লোক না হয়, যাকে শরয়ী ও সামাজিকভাবে বর্জন করা ওয়াজেব বা মুস্তাহাব।

(খ) এর পূর্বে যেন অন্য কেউ দাওয়াত না দিয়ে থাকে। সে অবস্থায় যে আগে দাওয়াত দিয়েছে, তার দাওয়াতই গ্রহণ করা ওয়াজেব। যেমন একই সঙ্গে দু'জন দাওয়াত দিলে এবং অপরজন আত্মীয় হলে, আত্মীয়তার খাতিরে তারই দাওয়াত প্রাধান্য পাবে। দুই প্রতিবেশী এক সঙ্গে দাওয়াত পেশ করলে, যার বাড়ির দরজা নিকটে তার দাওয়াতই প্রাধান্য পাবে।

(গ) দাওয়াত অনুষ্ঠানে যেন কোন প্রকার শরীয়ত-বিরোধী কর্ম না হয়। হলে দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়। তবে ঐ বিরোধী কর্ম বন্ধ করার ক্ষমতা থাকলে দুটি কারণে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব। প্রথমতঃ আল্লাহর নবী ﷺ দাওয়াত গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি সৎ কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং অলীমা অনুষ্ঠানে অশ্লীল বা অবৈধ কর্মকীর্তি (গান-বাজনা, ভিডিও, সিডি, মদ প্রভৃতি) চলে সে অলীমায় উপস্থিত হয়ে যদি উপদেশের মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারে তবে ঐ ভোজ খাওয়া বৈধ। নচেৎ না খেয়ে ফিরে যাওয়া ওয়াজেব। এ ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। তার দু-একটি নিম্নরূপঃ-

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ-মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, আদাবুয যিফাফ ১৬৩- ১৬৪ পৃঃ)*

একদা হযরত আলী ﷺ নবী ﷺ-কে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাঁর গৃহে ছবি দেখে ফিরে গেলেন। আলী ﷺ বললেন, 'কি কারণে ফিরে এলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি উত্তরে বললেন, "গৃহের এক পর্দায় (প্রাণীর) ছবি রয়েছে। আর ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না যে গৃহে ছবি থাকে।" *(ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৬১পৃঃ)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি দাওয়াত দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরে মূর্তি (বা টাঙ্গানো ফটো) আছে নাকি?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

অতঃপর সেই মূর্তি (বা ফটো) নষ্ট না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না। দূর করা হলে তবেই প্রবেশ করলেন। *(বাইহাক্বী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃঃ)*

ইমাম আওযাঈ বলেন, 'যে অলীমায় ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে সে অলীমায় আমরা হাজির হই না।' *(আদাবুয যিফাফ ১৬৫-১৬৬পৃঃ)*

(ঘ) দাওয়াতদাতা যেন মুসলিম হয়; অর্থাৎ কাফের বা অমুসলিম না হয়। নচেৎ তার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে---।"

(ঙ) দাওয়াতদাতা যে মাল থেকে দাওয়াত খাওয়াবে সে মাল যেন হারাম না হয়। তা হলে দাওয়াত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

(চ) দাওয়াত গ্রহণের ওয়াজেব পালন করতে গিয়ে যেন অন্য ওয়াজেব অথবা তার থেকে বড় ওয়াজেব নষ্ট করা না হয়।

(ছ) দাওয়াত গ্রহণকারী যেন তাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ক্ষতির স্বীকার হলে (যেমন ব্যয়বহুল বা দূরপাল্লার সফর করতে হলে, কাছে উপস্থিত থাকা জরুরী এমন স্বজনকে বর্জন করতে হলে,) দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব নয়। *(আল-ক্বাওলুল মুফীদ, ইবনে উষাইমীন ৩/১১১-১১৩ দ্রঃ)*

(জ) দাওয়াত যেন দাওয়াত গ্রহণকারী জন্য খাস হয়। আম হলে (যেমন ঃ কোন সভাতে সাধারণভাবে দাওয়াত পেলে) সে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব নয়।

২। মৌখিক বা সরাসরি দাওয়াত না হলেও দূত, এলচি, চিঠি, কার্ড বা টেলিফোনের মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব।

অবশ্য দাওয়াত কেবল দায় সারার নিয়তে দেওয়া উচিত নয়। দাওয়াত দেওয়াতে আন্তরিকতা থাকা আবশ্যিক। উপর উপর কেবল 'দাওয়াত নেবেন নাকি? আমার বাড়িতে খানা খাবেন নাকি? আমার বাড়িতে একদিন খান না কেন?' ইত্যাদি প্রশ্নসূচক বাক্য বলে দায় সারা হয় ঠিকই, কিন্তু লোকের মনে তার অনিচ্ছা ও আন্তরিকতাহীনতা ধরা পড়ে যায়।

৩। দাওয়াতের দিনে রোযা অবস্থায় থাকলেও দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া জরুরী। রোযা ফরয হলে খাওয়া যাবে না। নফল হলে তার এখতিয়ার আছে। অবশ্য দাওয়াতদাতার মন ভাঙ্গার ভয় থাকলে নফল রোযা ভেঙ্গে খাওয়াই উত্তম। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ-

“নফল রোযাদার নিজের আমীর। ইচ্ছা হলে সে রোযা থাকতে পারে, আবার ইচ্ছা না হলে সে তা ভাঙ্গতেও পারে।” *(আহমাদ ৬/৩৪১, তিরমিযী, হাকেম ১/৪৩৯, বাইহাক্বী ৪/২৭৬ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৩৮৫৪নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরী করলাম। তিনি তাঁর অন্যান্য সহচর সহ আমার বাড়িতে এলেন। অতঃপর যখন খাবার সামনে রাখা হল, তখন দলের মধ্যে একজন বলল, ‘আমার রোযা আছে।’ তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমাদের ভাই তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খরচ (বা কষ্ট) করেছে।” অতঃপর তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, “রোযা ভেঙ্গে দাও। আর চাইলে তার বিনিময়ে অন্য একদিন রোযা রাখ।” *(বাইহাক্বী ৪/২৭৯, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল ১৯৫২নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এই ভাঙ্গা রোযা কাযা করা জরুরী নয়। *(আদাবুয যিফাফ ১৫৯পৃঃ)*

৪। মেহমান এলে, তাকে দেখে খোলা মনে মেযবানের খুশী প্রকাশ করা এবং তাকে এমন কথা বলে স্বাগত জানানো উচিত, যাতে সেও খোশ হয় এবং সকল প্রকার দ্বিধা ও সংকোচ তার মন থেকে দূর হয়ে যায়। আসন ছেড়ে উঠে যাওয়া সুমহান চরিত্রের পরিচায়ক।

রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। *(আবূ দাঊদ ৫২১৭, তিরমিযী ৩৮৭২নং)*

৫। মেহমানের সাথে যদি কোন অনাহূত লোক অযাচিতভাবে এসে যোগ দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে মেযবানের কাছে অনুমতি নেওয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে ঐ বিনা দাওয়াতের অযাচিত লোকটির খাতির-তোয়ায করা মেযবানের জন্য ওয়াজেব নয়। বরং সে চাইলে ঐ ফাউ লোকটিকে অনুমতি নাও দিতে পারে।

একদা এক আনসারী আল্লাহর নবী ﷺ সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করলে রাস্তায় একটি লোক তাঁর সঙ্গ ধরে। তিনি সেই আনসারী সাহাবীর কাছে পৌঁছে বললেন,

"তুমি আমাকে নিয়ে মোট পাঁচ জনকে দাওয়াত দিয়েছিলে। কিন্তু পথিমধ্যে এই লোকটি আমাদের সঙ্গ ধরে। এখন তুমি ওকে অনুমতি দিলে দিতে পার। নচেৎ বর্জন করলেও করতে পার।" আনসারী বললেন, 'বরং ওকে অনুমতি দিচ্ছি।' *(বুখারী ৫৪৩৪, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯নং)*

৬। মেহমানের খাতিরে অতিরঞ্জন

মেহমানের খাতিরে বাড়াবাড়ি করা মেযবানের জন্য বৈধ নয়। স্বাভাবিকভাবে যতটা খাওয়াবার তার সাধ্য আছে তার থেকে বেশী খাওয়াবার চেষ্টা করা এবং তার জন্য নতুন নতুন দামী দামী ও নানা রকমের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এবং টক-মিষ্টি-ঝাল-লবণ জাতীয় নানা খাদ্য প্রস্তুত অথবা ক্রয় করা মেযবানীতে অতিরঞ্জন করার পর্যায়ভুক্ত।

মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ যেন তার মেহমানের জন্য অবশ্যই সাধ্যাতীত কষ্টবরণ না করে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৪০নং)*

উমার বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, 'আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।' *(বুখারী ৭২৯৩নং)*

মেহমানকে সওয়াবের নিয়তে খাওয়ালে সওয়াব আছে। কিন্তু তাতে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। নাম ছুটাবার উদ্দেশ্যে খরচে ঘাম ছুটানোর মাঝে কোন লাভ নেই। সওয়াবও হবে না, উপরন্তু কোন কিছুতে একটু ত্রুটি ঘটলে বদনাম থেকে রেহাইও পাওয়া যাবে না। আর নাম ছুটলেও তার দামই বা কি আছে?

দাওয়াতে কম্‌পিটিশন করাও বৈধ নয়। যেমন ঃ অমুক ভাতের সাথে গোমাংস ও মাছ খাইয়েছে, আমি খাসির মাংস ও মাছ খাওয়াব। পরবর্তীতে অমুক আবার তা দেখে খাসির মাংস ও মাছের সাথে মুরগীর মাংসও যোগ করে দিল। আর এইভাবে প্রতিযোগিতার ময়দানে অনেকেই চায় যে, খাওয়ানোর ব্যাপারে সেই প্রথম স্থান অধিকার করবে। অথচ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'প্রতিযোগীদের খানা খেতে নিষেধ করা হয়েছে।' *(আবূ দাঊদ ৩৭৫৪নং)* যেহেতু তাতে রয়েছে লোকপ্রদর্শন ও পরস্পর গর্ব প্রকাশ করার প্রতিযোগিতা।

পক্ষান্তরে ইসলাম আমাদেরকে পানাহারে অপচয় করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾ (الأعراف ٣١)

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ ﴾ (الإسراء ٢٦-٢٧)

অর্থাৎ, আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।” *(সূরা ইসরা ২৬-২৭ আয়াত)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যা ইচ্ছা খাও-পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও গর্ব।” *(বুখারী)*

৭। কারো দাওয়াত পেলে খাওয়ার খুব আগেভাগে যাওয়া এবং খাওয়ার শেষে গল্প করতে থাকা বৈধ নয়। কারণ তাতে মেজবানের অসুবিধা হতে পারে। এই সুন্দর আদব বর্ণনা করে কুরআন বলে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা (ভোজন পূর্বে ও পরে) কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ, (অপ্রয়োজনীয় প্রতীক্ষা) নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) সংকোচ ও লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ হক বলতে সংকোচবোধ করেন না। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

৮। মুসলিম ভাই দাওয়াত খাওয়ালে বা কোন খাবার পেশ করলে তাকে এ প্রশ্ন করা বৈধ নয় যে, সে খাবার হালাল, না হারাম? যেহেতু তাতে মুসলিম ভায়ের প্রতি কুধারণা হয় এবং তার বেইজ্জতি হয়। তাছাড়া তা হল এক প্রকার অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি।

মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভায়ের নিকট প্রবেশ করে এবং সে তাকে নিজ খাবার খাওয়ায়, তখন সে যেন তা খেয়ে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে। যদি সে নিজ পানীয় পান করায়, তাহলে সে যেন তা পান করে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে।” *(সহীহুল জামে' ৫১৮-নং)*

অবশ্য যদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সন্দেহ থাকে, তাহলে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া

জরুরী। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২/২০৩)*

৯। দাওয়াতের মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের অন্যান্যদের আগে খাতির হওয়া দরকার। যেহেতু ইসলামে ছোটদের তুলনায় বড়দের পৃথক মর্যাদা রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং আমাদের বড়দের অধিকার চিনে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী নয় এমন হাফেয এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করলে এক প্রকার আল্লাহকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

একদা তিনি স্বপ্নে নিজ দাঁতন দুটি লোকের মধ্যে ছোটকে দিলে জিবরীল ﷺ তাঁকে বললেন, 'বড়কে দিন।' *(বুখারী তা'লীক্ব, মুসলিম ৩০০৩নং)*

অবশ্য অন্য এক হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করার সময় ডান দিক থেকেই শুরু করা উত্তম। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। (অতঃপর সাহাবাগণকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন।) তাঁর ডানে ছিল একটি কিশোর এবং বামে ছিল বৃদ্ধরা। তিনি কিশোরটিকে বললেন, "তুমি কি অনুমতি দাও যে, এই পানীয় আমি ওদেরকে দিই?" কিশোরটি বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট থেকে পাওয়া ভাগ আমি অন্য কাউকে আগে দিতে চাই না।' সুতরাং তিনি তা তার হাতেই ধরিয়ে দিলেন। *(বুখারী ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০নং)*

১০। পানাহারের পর মেহমানের উচিত, মেযবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার জন্য দুআ করা। যেমনঃ-

ক। اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম অগফির লাহুম অরহামহুম।

অর্থ- হে আল্লাহ! ওদের তুমি যা দান করেছ তাতে ওদের জন্য বর্কত দান কর। ওদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ওদের প্রতি রহম কর। *(আহমাদ ১৭২২০, মুসলিম ২০৪২, আবূ দাউদ ৩৭২৯, তিরমিযী ৩৫৭৬, দারেমী ২০২২নং)*

খ। أَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ۔

উচ্চারণ- আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ, অ আফত্বারা ইনদাকুমুস্ব স্বা-য়িমূন।

অর্থ- সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক, ফিরিশ্তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করুন এবং আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক। *(মুঃ আহমাদ ৩/১৩৮, বাইহাক্বী ৭/২৮৭)*

অপরের নিকট পান করার পর দুআ ঃ-

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আত্বইম মান আত্বআমানী অসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থ - হে আল্লাহ! তাকে তুমি খাওয়াও যে আমাকে খাওয়াল এবং তাকে পান করাও যে আমাকে পান করাল। *(আহমাদ ২৩৩০০, মুসলিম ২০৫৫, তিরমিযী ২৭১৯নং)*

কুটুম বা মেযবানের নিকট রোযা ইফতার করলে বলতে হয় ঃ-

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

উচ্চারণ- আফত্বারা ইনদাকুমুস্ব স্বা-য়িমূন, অ আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

অর্থঃ- আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক, সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক এবং ফিরিশ্তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। *(আহমাদ ১১৭৬৭, আবু দাউদ ৩৮৫৪, দারেমী ১৭৭২নং)*

১১। মেযবান যে খাবার পেশ করে, তাই সন্তুষ্টচিত্তে খাওয়া উচিত মেহমানের। 'এটা খাই না, ওটা খাই না, এটা আমাদের ছাগলে খায়, এ খাবার আমরা ফেলে দিই --' ইত্যাদি বলে নাক সিঁটকানো অহংকার প্রদর্শনের শামিল। রুচি না হলে, ডাক্তার কর্তৃক নিষিদ্ধ হলে অথবা পছন্দ না হলে এমন কিছু বলে জবাব দেওয়া উচিত, যাতে মেযবানের মনে কষ্ট না হয়। যেমন খাবারে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, মেহমানের উচিত নয়, মেযবানের বদনাম করা।

মহানবী ﷺ কখনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। কিছু খেতে ইচ্ছা হলে খেতেন, না হলে তা বর্জন করতেন। *(বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪নং প্রমুখ)*

১২। মেহমান গিয়ে তিনদিনের বেশী মেহমানি করা উচিত নয়। উচিত নয় মেযবানকে গোনাহ অথবা কষ্টে ফেলা। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "মেহমানের পারিতোষিক হল এক দিন-রাত। মেহমান-নেওয়াযী তিন দিন। আর তার বেশী হল সদকাহ স্বরূপ। কোন মুসলিমের জন্য তার ভায়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "এ ওর কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের খাতির করতে পারে।" *(বুখারী ৬১৩৫, মুসলিম)*

অনেক অকর্মণ্য, বেকার ও কুঁড়ে লোক অযাচিত মেহমান হয়ে আত্মীয়, বিয়াই বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মেহমানী করে বেড়াতে ভালোবাসে। তিন দিনের বেশী বসে বসে সদকা খেতে আনন্দবোধ করে। কিন্তু সে এতটুকু অনুভব করতে পারে না যে, তার জন্য মেযবান কষ্ট পাচ্ছে। ভালো খাবার ও শোবার জায়গার ব্যবস্থা করতে তাকে বেগ পেতে হচ্ছে। বদনামের ভয়ে সে হয়তো ঋণ করেও মাছ-মুরগী-ডিম যোগাড় করে তার খাতির করে যাচ্ছে। এমন ছুঁচা ও বেহায়া মেহমান নিয়ে বাড়ির লোক সত্যই ফাঁপরে পড়ে। স্পেশাল রান্নার চাপ পড়ে স্ত্রীর উপর। তাতে অনেক স্ত্রী বিরক্ত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ বাধে। বাড়িতে ঐ মেহমান নিয়ে গীবত চলে। ঐ মেহমান সম্বন্ধে নানা কুধারণা করা হয়। মনে মনে মেযবান ও তার বাড়ির লোক তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। আর এ সবের ফলে তার সওয়াব বাতিল, বরং উল্টে সে গোনাহর শিকার হয়ে যায়। কষ্ট হয় অথচ তার ফলও মিলে না।

অবশ্য সব কুটুম যে সমান, তা নয়। অনেক কুটুম আছে যে সত্যই মন থেকে থাকতে ও বেড়াতে বলে। সে ক্ষেত্রে তিনদিনের বেশী থাকায় দোষ নেই। তবুও মেহমানের উচিত, সময় থাকতে নিজের মান বাঁচিয়ে নেওয়া।

উপরোক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মেযবানের উচিত, মেহমান এলে প্রথম একদিন ও একরাত তার ভালোরূপ খাতির করা; অতঃপর দুইদিন স্বাভাবিক খাতির করা। তারপরেও মেহমান থেকে গেলে তাকে সাধারণ খাবার দেওয়া এবং তার প্রতি বিরক্ত না হওয়া। কারণ, তাতে সে সদকার সওয়াব অর্জন করতে থাকবে।

অন্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যামতে মেযবান মেহমানের তিনদিন খাতির করবে এবং তার একদিন ও একরাতের (পারিতোষিক) খাবার সাথে বেঁধে দিবে।

অনেকের মতে মেহমান এসে থেকে গেলে তার খাতির তিনদিন করা জরুরী। তারপর জরুরী নয়, সদকাহ। আর মেহমান এসে না থাকলে তাকে পারিতোষিক এতটা পরিমাণ খাবার সাথে বেঁধে দিতে হবে, যাতে তার ২৪ ঘন্টা পথের জন্য যথেষ্ট হয়।

১৩। মেহমানকে বিদায়কালে বাড়ির দরজা পর্যন্ত তার সাথে সাথে যাওয়া উচিত। গাড়িতে চড়ার সময় তার সহযোগিতা করা, ভারী কিছু থাকলে বয়ে দেওয়া ইত্যাদি কর্ম সুন্দর ব্যবহার ও চরিত্রের পরিচায়ক। যেহেতু এতে মেহমানকে পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যাপারে সলফ কর্তৃক একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২২৭ দ্রঃ)*

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের আদব

যার কাছে দুঃখের কথা বলে মন হাল্কা হবে এমন একজন সুহৃদ সাথী না থাকলে জীবন একটি মরুময় প্রান্তরের মত। জীবনে চলার পথে সঙ্গী থাকলে চলার পথ সহজ হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে, সংসার ও ইসলামী দাওয়াতের কাজে অনেক কষ্ট হাল্কা হয়। এ বিষয়ে একাধিক পুস্তকে আলোচনা করেছি বলে এখানে কেবল প্রধান প্রধান আদবের শিরোনাম উল্লেখ করে ক্ষান্ত হচ্ছি।

১। দ্বীনদার ও জ্ঞানী লোক দেখে তার সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন।

২। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব করুন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যাকে ভালোবাসবেন, তাকে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে বাসুন। আর যাকে ঘৃণা বাসবেন, তাকেও আল্লাহর ওয়াস্তে বাসুন। পরবর্তীতে খেয়াল রাখুন, যাতে ঐ ভালোবাসা কোন কামনা বা স্বার্থের ভালোবাসায় পরিণত না হয়ে যায়।

৩। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে বিনম্র ব্যবহার এবং হাসিমুখ সাক্ষাৎ প্রয়োগ করুন। তাতে প্রেম স্থায়ী হবে।

৪। যথাসাধ্য পরস্পর উপহার বিনিময় করুন। যেহেতু এটিও একটি প্রেমের বাহুবন্ধন।

৫। একে অপরকে উপদেশ প্রদান করুন, সৎ পরামর্শ দিন এবং বিপদে-আপদে সহযোগিতা করুন।

৬। দ্বীনী ভাই বা বন্ধুর সাথে কোন বিষয় নিয়ে কোন তর্ক করবেন না। তার সামনে কোন প্রকার গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করবেন না। আপনি নিজেকে তার থেকে বড় ও ভালো মনে করবেন না।

৭। সুমহান চরিত্রের অধিকারী হন। অপরকে চরিত্রবত্তা শিক্ষা দিন। যেখানেই থাকুন সেখানেই বৃষ্টির মত সকলকে উপকৃত করুন।

৮। দ্বীনী ভাই বা বন্ধুর প্রতি কুধারণা রাখবেন না। তার কোন গোপন বিষয় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন না।

৯। সে কোন ভুল করলে ক্ষমা করে দিন, তার কোন কথায় রাগ হলে তা হজম করে নিন।

১০। আপনি তার নিকট কোন ভুল করে ফেললে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং সে কোন ভুল করে আপনার কাছে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিন।

১১। ভাই-বন্ধুর ব্যাপারে আপনার মনের ভিতর কোন প্রকারের হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও সন্দেহকে স্থান দেবেন না।

১২। দ্বীনী ভাই বা বন্ধুকে উপহাস ছলেও কোন মন্দ খিতাব দিয়ে ডাকবেন না।

১৩। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলে তা সত্বর দূর করে নেবেন।

১৪। আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি যে তার উপকার করেছেন বা করছেন তা কারো কাছে বলবেন না। তার উপকার করে প্রশংসার বাসনা মনে গোপন রাখবেন না।

১৫। দ্বীনী ভাই বা বন্ধুর কোন রহস্য ও ভেদ অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না।

সর্বশেষে দ্বীনের ৩টি বিপরীতধর্মী নীতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখুন ঃ (ক) দান করলে কমে না, বরং বাড়ে। (খ) লোকের কাছে নিজেকে ছোট জানলে, তাদের কাছে বড় হওয়া যায়। (ভুল স্বীকার করলে সম্মান বাড়ে।) এবং (গ) ক্ষমা প্রদর্শন করলে ইজ্জত বৃদ্ধি পায়।

এ বিষয়ে অধিক জানতে **'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান'** এবং **'সুখের সন্ধান'** বই দুখানি পড়তে যুবক ভাইদের কাছে অনুরোধ রাখছি।

মজলিসের আদব

মুসলিম যেখানে বসবে সেই মজলিসের এবং তার বৈঠকের বিভিন্ন আদব আছে ইসলামে। যা প্রত্যেক মুসলিমকে পালন করে সুন্দর চরিত্রের মালিক হতে হয়। নিম্নে সেই সকল আদব বিবৃত হল ঃ-

১। যে মজলিসে বসবেন, সে মজলিসে আল্লাহর যিক্র করতে ও তাঁর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়তে ভুল করবেন না।

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ই এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর যিক্র করে না এবং নবীর ﷺ উপর দরূদ পাঠ করে না, সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।" *(আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ২৬৯১নং, বাইহাকী, আহমদ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তিরমিযীর।)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে আল্লাহ যিক্র না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মত কোন কিছু হতে উঠে গেল। আর

তাদের জন্য রয়েছে ক্ষতি (ও পরিতাপ)।” *(আবূ দাউদ ৪৮৫৫নং, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭নং)*

অবশ্য উচ্চস্বরে, সমস্বরে বা জামাআতী দরূদ-যিক্‌রের কথা বলা হয়নি। আসলে জামাআতী দরূদ-যিক্‌র হল বিদ্‌আত।

আল্লাহ যিক্‌র ছাড়া অন্য কথা বেশী বলা হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার একটি কারণ। আর এমন হৃদয় আল্লাহর নিকট থেকে অনেক দূরে। *(তিরমিযী ৩৩৮০নং)* অতএব যে মজলিস আল্লাহর কথা আলোচনার জন্য নয়, সে মজলিসে অংশগ্রহণ করে অযথা সময় নষ্ট করলে মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। কোন নসীহতে সে হৃদয় নরম হবে না, কারো ব্যথায় সে হৃদয় আহা করবে না। আর কিয়ামতে হবে বড় পরিতাপ ও আফশোসের বিষয়।

তাছাড়া যে মজলিসে আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, কুরআন ও হাদীসের কথা আলোচিত হয়, দ্বীন ও ইল্‌মের কথা বলা হয়, সে মজলিস আল্লাহর নিকট বড় পছন্দনীয়। আর এই শ্রেণীর মজলিসে যারা বসে, তারা যিক্‌র না করলেও, আলোচনা না শুনলেও, কেবল সেখানে বসার জন্য তাদের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিক্‌র খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিক্‌ররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহবান করে বলতে থাকেন, ‘এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।’ সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার বান্দারা কি বলছে?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি আমাকে দেখেছে?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।’ আল্লাহ বলেন, ‘কি হত, যদি তারা আমাকে দেখত?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরো বেশী বেশী ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত।’ আল্লাহ বলেন, ‘কি চায় তারা?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘তারা আপনার কাছে বেহেশ্‌ত্‌ চায়।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি বেহেশ্‌ত্‌ দেখেছে?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।’ আল্লাহ বলেন, ‘কি হত, যদি তারা তা দেখত?’ ফিরিশ্তারা বলেন, ‘তারা তা দেখলে তার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হত। আরো বেশী বেশী তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরো বড় হত।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি থেকে পানাহ চায়?’

ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে বেশী বেশী করে তা হতে পলায়ন করত। বেশী বেশী ভয় করত।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।' ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।' *(আহমাদ ৭৩৭৬, বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯, তিরমিযী ৩৬০০নং)*

২। কার সাথে উঠা-বসা করবেন?

মানুষ যার সাথে উঠা-বসা করবে, সে অবশ্যই তার দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত হবে। আর সে জন্যই কারো কাছে বসার আগে জেনে নেওয়া উচিত, সে ভালো লোক কি না?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" *(আহমাদ ৭৯৬৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৩, তিরমিযী ২৩৭৮, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৯২৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-বিক্রেতা ও কামারের মত। আতর-বিক্রেতা (এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততঃপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে।

পক্ষান্তরে কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮নং)*

বলা বাহুল্য, ভালো লোকের সাথে উঠা-বসা করুন, ভালো হবেন, ভালো পাবেন। আর খারাপ লোককে প্রভাবান্বিত না করতে পারলে বর্জন করুন। নচেৎ খারাপ হয়ে যাবেন, খারাপ পাবেন।

বিদআতীর মজলিসে বসবেন না। কারণ আপনার মর্মমূলেও বিদআত অনুপ্রবেশ করে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সলফদের কিছু বাণী উদ্ধৃত হল ঃ-

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে বসে, সে ব্যক্তি হতে সাবধান! যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে বসে, তাকে কোন হিকমত (জ্ঞান) দান

করা হয় না। আমি পছন্দ করি যে, আমার ও বিদআতীর মাঝে লোহার কেল্লা হোক। কোন বিদআতীর নিকট খাওয়া অপেক্ষা কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানের নিকট খাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়!' *(লালকাঈ ৪/৬৩৮, ১১৪৯ নং)*

হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, 'কারো জন্য বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করা, মিশা এবং সৌহার্দ্য রাখা উচিত নয়।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭৫, ৪৯৫নং)*

হাবীব বিন আবীয যাবার বলেন, 'বিদআতী কথা বললে মুহাম্মাদ বিন সীরীন নিজ কানে আঙ্গুল রেখে নিতেন। অতঃপর বলতেন, ওর মজলিস থেকে না ওঠা পর্যন্ত আমার জন্য কথা বলা বৈধ নয়।' *(ঐ ২/৪৭৩, ৪৮৪নং)*

আইয়ুব সাখতিয়ানীকে জনৈক বিদআতী বলল, 'হে আবূ বাক্‌র! আপনাকে একটি শব্দ জিজ্ঞাসা করব।' আইয়ুব নিজ (অর্ধেক) আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করতে করতে বললেন, 'আধা শব্দও নয়, আধা শব্দও নয়।' *(ঐ ২/৪৪৭, ৪০২নং)*

ইমাম আহমাদ (রঃ) মুসাদ্দাদকে লিখা চিঠিতে বলেন, 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে কোন বিদআতীর কাছে পরামর্শ নিও না এবং তোমার সফরে তাকে সঙ্গী করো না।' *(আল-আদাবুশ শারই'য়্যাহ, ইবনে মুফলেহ ৩/৫৭৮)*

ইবনুল জাওযী বলেন, 'ওদের সংসর্গ থেকে সাবধান! শিশুদেরকেও ওদের সাথে মিশতে বাধা দেওয়া ওয়াজেব। যাতে তাদের মনে-মগজে বিদআত বদ্ধমূল না হয়ে যায়। আর তাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস দিয়ে মশগুল করে রাখ, যাতে তা তাদের প্রকৃতিতে (দুধে-চিনির মত) মিশে যায়।' *(ঐ ৩/৫৭৭-৫৭৮)*

বার্বাহারী বলেন, 'কোন ব্যক্তির কাছে কোন প্রকার বিদআত প্রকাশ পেলে তুমি তার থেকে সাবধান থেকো। কেননা, সে যা প্রকাশ করে তা অপেক্ষা যা গোপন করে তা অনেক বেশী।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, ইবনে মুফলেহ ১২৩পৃঃ, ১৪৮-নং)*

তিনি আরো বলেন, 'বিদআতীরা হল বিছার মত। বিছা নিজের মাথা ও সারা দেহকে মাটিতে লুকিয়ে রাখে এবং কেবল হুলটিকে বের করে রাখে। অতঃপর যখনই সুযোগ পায়, তখনই হুল মারে। তদনুরূপ বিদআতী লোকেদের মাঝে গুপ্ত থাকে। কিন্তু যখন সুযোগ পায়, তখন নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করে ফেলে।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ২/৪৪)*

পক্ষান্তরে কোন ফাসেকের কাছেও বসবেন না। কারণ তার নিকট থেকে বাজে কথা, লোকের গীবত, অশ্লীল বাক্য ছাড়া আর কি শোনার আশা করেন? তার নিকট নোংরা কিছু দেখা ছাড়া আর কি দেখার আশা করেন? তার সাথে উঠা-বসা করে আপনি জামাআতে নামায পড়তে পারবেন না। ধীরে ধীরে রঙ-তামাশায় মত্ত হয়ে পরিশেষে আপনিও হয়তো ফিরে যাবেন। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'লোক সকলকে তাদের

সঙ্গী-সাথী দেখে (ভালো-মন্দ) গণ্য কর। কেননা, যে মুসলিম, সে মুসলিমের অনুসরণ করে এবং যে ফাসেক, সে ফাসেকের অনুসরণ করে।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭৭, ৫০২নং, এই উক্তির প্রথমাংশ বাগবী শারহুস সুন্নাহ ১৩/৭০ তে উল্লেখ করেছেন)* সুতরাং নাউযু বিল্লাহি মিনায য্বালালাতি বা'দাল হিদায়াহ।

৩। তদনুরূপ এমন লোকদের সাথেও বসবেন না, যারা মুনাফিক ও ইসলামের গোপন শত্রু। যারা নামে মুসলমান হলেও কামে শয়তান। যারা আল্লাহর দ্বীন ও আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, কুফরী করে। তাদের মজলিসে বসতে নিষেধ করে মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেন,

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, যখন তুমি দেখবে যে, তারা আমার নিদর্শন (আয়াত) সম্বন্ধে (সমালোচনামূলক) নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে (এ কথা) ভুলিয়ে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوْضُوْا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি (এই বিধান) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসবে না; নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। অবশ্যই আল্লাহ মুনাফিক (কপট) ও কাফের (অবিশ্বাসী)দের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

৪। এমন জায়গায় বসবেন না, যেখানে বসলে পাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার হক

কি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ২৬৭৫ নং)*

অনুরূপ বাড়ির ছাদে বা এমন উঁচু জায়গায় বসতেও নিষেধ করেছেন আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। *(দেখুনঃ সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/ ১৪-১৫)*

৫। এমন ঢঙে বসবেন না, যেমন ঢঙে বসতে আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে নিষেধ করেছে।

শারীদ বিন সুয়াইদ ؓ বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। তখন আমি এমন ঢঙে বসেছিলাম যে, বাম হাতকে পশ্চাতে রেখেছিলাম এবং (ডান) হাতের চেটোর উপর ভরনা দিয়েছিলাম। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "(আল্লাহর) ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী)দের বসার মত বসো না।" *(আহমদ ৪/৩৮৮, আবূ দাউদ ৪৮৪৮নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৫৮নং)*

যেমন মহানবী ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "(রোদ ও ছায়ার মাঝে বসা হল) শয়তানের বৈঠক।" *(আহমদ ৩/৪১৩, হাকেম ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৩৮নং)*

পরিধানে লুঙ্গি বা লুঙ্গিজাতীয় এক কাপড় পরে উভয় পায়ের রলাকে খাড়া করে রানের সাথে লাগিয়ে উভয় পা-কে দুই হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরে অথবা কাপড় দ্বারা বেঁধে বসা বৈধ নয়। *(মুসলিম, আবূ দাউদ ১১১০, তিরমিযী ৫১৪নং)* কারণ, এতে শরমগাহ প্রকাশ পাওয়ার, চট্ করে ঘুম চলে আসার এবং তাতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাই। অবশ্য লুঙ্গির ভিতরে অন্য কাপড় (আন্ডার প্যান্ট) থাকলে, শরমগাহ প্রকাশের ভয় এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে ঐ শ্রেণীর বসা দোষাবহ হবে না।

৬। কোন মজলিসে এলে সালাম দিন। অতঃপর যেখানে ফাঁক পান সেখানে বসে যান।

৭। মজলিসে এসে কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসবেন না, কাউকে বসাবেন না। কেউ কোন প্রয়োজনে উঠে গেলে এবং পুনরায় সে ফিরে আসবে বলে মনে হলে তার জায়গাতেও বসবেন না। কারণ সেটা তার জায়গা, সেই তার বেশী হকদার।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার বসার জায়গা থেকে উঠে যায়, অতঃপর সে ফিরে আসে, তখন সেই তার বেশী হকদার হয়।" *(আহমাদ ৭৫১৪, মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, ইবনে মাজাহ ৩৭১৭, দারেমী ২৬৫৪নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ বলেন, নবী ﷺ কোন লোককে তার বসার জায়গা থেকে

উঠাতে এবং তার জায়গায় অন্যকে বসতে নিষেধ করেছেন। বরং তোমরা সরে সরে বসে (মজলিস) প্রশস্ত কর।

ইবনে উমার ﷺ কোন লোককে উঠিয়ে তার জায়গায় বসতে অপছন্দ করতেন। *(বুখারী ৬২৭০, মুসলিম ২১৭৭নং, প্রমুখ)*

যাতে মুসলিম ভায়ের প্রতি কুধারণা ও ঘৃণা না জন্মে, তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ইসলামের এই সুন্দর ব্যবস্থা।

কিন্তু কেউ যদি আপনাকে দয়া অথবা সম্মান প্রদর্শন করে নিজ জায়গা ছেড়ে দেয়, তাহলে সেই জায়গায় বসা হারাম নয়। তবে যদি বুঝতে পারেন যে, সে হয়তো মনে মনে কষ্ট পাবে অথবা তার অবস্থা দেখে আন্দাজ করতে পারেন যে, তার মন হয়তো চায় না ঐ জায়গা ছাড়তে, তাহলে সেখানে না বসে অন্য জায়গায় বসে যান। সেটাই হবে সবার জন্য উত্তম।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ করে জুমআর দিন মসজিদে প্রথম কাতারে মুসাল্লা বা রুমাল ইত্যাদি বিছিয়ে জায়গা দখল করা বৈধ নয়। প্রথম প্রথম যে আসবে সেই সে জায়গার অধিক হকদার।

৮। কোন মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় সমস্ত জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে, নড়ে-সড়ে বসলে অল্প-বিস্তর জায়গা হয়েই যায়। সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করে বসতে জায়গা দেওয়া মুমিনের কর্তব্য।

এই আদব বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ ﴾ (المجادلة ١١)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ তোমাদের জন্য (বেহেশ্তের স্থান) প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। *(সূরা মুজাদালাহ ১১ আয়াত)*

৯। মজলিসে দুটি লোক (আত্মীয় বা বন্ধু) একত্রে বসে থাকলে, আপনি গিয়ে তাদের মাঝে বসে উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবেন না। যেহেতু তাতে তাদের মনে কষ্ট হবে। অবশ্য অনুমতি দিলে অথবা তারা নিজ থেকে আপনাকে তাদের মাঝে বসালে আপনি বসতে পারেন।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “বিনা অনুমতিতে দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা কোন

মানুষের জন্য বৈধ নয়।” *(আহমাদ ৬৯৬০, আবূ দাঊদ ৪৮৪৫, তিরমিযী ২৭৫২নং)*

১০। মজলিসে উপস্থিত হয়ে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে আপনি সেখানে বসে যান। সাহাবী জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, ‘আমরা নবী ﷺ-এর মজলিসে এলে প্রত্যেকে সেখানে বসে যেত, যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে।’ *(আহমাদ ২০৪২৩, আবূ দাঊদ ৪৮২৫, তিরমিযী ২৭২৫নং)*

সুতরাং পিছনে এসে সামনে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে অপরকে কষ্ট দেবেন না। সামনে এক-আধটুক ফাঁকা জায়গা থাকলেও লোকেদের গর্দান চিড়ে সামনে অগ্রসর হবেন না। যেহেতু এ সময় আপনার লোকেদের গর্দানে হাত দেওয়া এবং অনেকের গায়ে আপনার পা লেগে যাওয়াটা বেআদবের পরিচয়। আর সামনের ফাঁক বন্ধ করার দায়িত্ব হল সামনের লোকেদের। তাদের উচিত হল, নড়ে-সড়ে সামনে ঘেঁসে বসা।

১১। একই মজলিসে ৩ জন বসে থাকলে তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে নিয়ে আপনি কোন গোপন কথা বলবেন না অথবা ফিস্‌ফিসিয়ে কোন কথাই বলবেন না অথবা দূরে নিয়ে গিয়ে কোন আলোচনা করবেন না। কারণ এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হবে। সে আপনাদের প্রতি কুধারণা করবে। হয়তো বা মনে করবে যে, আপনারা তারই বিরুদ্ধে কিছু বলছেন অথবা আপনারা তার নিকট কোন কথা গোপন করতে চাচ্ছেন এবং সে আমানতে খেয়ানতের ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করছেন। যেমন কালা লোকের সামনে দুজনে কথা বললে তার মন ও মেজাজ বিগড়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু সে তাদের কথা শুনতে পায় না এবং মনে করে কথা তারই বিরুদ্ধে।

তদনুরূপ আপনারা দুইজন এক ভাষার হলে এবং অপরজন অন্য ভাষার হলে এবং সে আপনাদের ঐ ভাষা না বুঝলে যে ভাষা সবাই বুঝে সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত। এ ক্ষেত্রে আপনার নিজেদের ভাষায় সশব্দে তার সামনে কথা বললেও তার মনে কষ্ট হবে। অতএব সেখানেও এই আদবের খেয়াল রাখুন।

মহানবী ﷺ বলেন, “(কোন তিন ব্যক্তি) যেন তৃতীয়জনকে ছেড়ে দুই জনে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা না বলে। কারণ, তা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে।” *(বুখারী ৬২৮৮, মুসলিম ২১৮৩নং)*

বলা বাহুল্য, যদি তিনের বেশী লোক থাকে, তাহলে দুই জনের চুপে চুপে অথবা একটু সরে গিয়ে কানে কানে কথা বলা দূষণীয় নয়।

১২। পরকীয় কথায় কানাচি পাতা হারাম।

লোকেরা কোন গোপন কথা আড়ালে আস্তে বলাবলি করলে অথবা দূরে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বললে কোন দেওয়াল বা দরজা বা পর্দার আড়াল থেকে কান খাড়া করে কর্ণপাত করা বা তাদের সেই গোপন কথা কান পেতে শোনা বৈধ নয়, যে কথা শোনাতে তারা

অপছন্দ করে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু’টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।” *(আহমাদ ১৮৬৯, বুখারী ৭০৪২, আবূ দাঊদ ৫০২৪, তিরমিযী ১৭৫১নং)*

১৩। মজলিসে প্রগল্ভ হয়ে প্রায় সর্বদা সব কথাতে, হাসির কথাতে এবং অহাসির কথাতেও ‘হো-হো, হা-হা’ করে হাসা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, অধিক হাসিতে হৃদয় মারা যায়।” *(ইবনে মাজাহ ৪১৯৩নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ঐ শ্রেণীর হাস্যকারী লোকের গাম্ভির্য থাকে না এবং অপরের মনে তার প্রতি সম্মান ও সমীহ লোপ পায়।

১৪। মজলিসে থাকাকালে ঘেউ ঘেউ করে ঢেকুর তোলা উচিত নয়। ঢেকুর এলে যথাসম্ভব শব্দ দমন করে নিন। যেহেতু লোকেরা তা পছন্দ করে না। ঢেকুরের সাথে এমন গ্যাস বের হতে পারে, যা লোকেদের নাকে খারাপ লাগে। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি ঢেকুর তুললে তিনি তাকে বললেন, “আমাদের নিকট তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। দুনিয়ায় যে অধিক পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতে সে অধিক ক্ষুধার্ত হবে।” *(তিরমিযী ২৪৭৮, ইবনে মাজাহ ৩৩৫০নং)*

১৫। মজলিসে বসার সময় আদবের সাথে থাকুন। যাতে লোকে আপনাকে খারাপ ভাবে সে রকম কাজ করবেন না। যেমন কারো দিকে পা করে বা পা মেলে বসবেন না। দুজনের জায়গা একা নিয়ে বসবেন না। সীট বা টেবিলের উপর পা তুলে বসবেন না। দাঁত বা নাক খুঁটবেন না। হাওয়া ছাড়বেন না। কারো হাওয়া ছাড়া শুনে হাসবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ কারো হাওয়া ছাড়া শুনে হাসতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে’ ৬৮৯৬নং)* তিনি বলেছেন, “তোমাদের কেউ যে কাজ নিজেও করে সে কাজে হাসে কেন?” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৪২নং)*

হাঁচি এলে শব্দ হাল্কা করার চেষ্টা করুন এবং মুখে হাত রেখে নিন। যাতে নাক বা মুখ হতে নির্গত কোন জিনিস অপরের গায়ে না লাগে।

হাই তুললে যথাসম্ভব দমন করার চেষ্টা করুন এবং মুখে হাত রেখে নিন।

১৬। মজলিসে কেউ কথা বললে কান দিয়ে শুনুন। বক্তার সামনে অমনোযোগিতা, চাঞ্চল্য, চাপল্য ও বৈমুখ্য প্রকাশ করবেন না। যা বলা হচ্ছে আপনি তার সবকিছুই জানলে বা বক্তা অপেক্ষা আপনি বেশী জানলে আপনি আপনার ভাবে-ভঙ্গিমায় বা চেহারায় তা প্রকাশ হতে দিবেন না। এমন স্থিরভাবে বসে থাকুন, যেন আপনাকে দেখে মনে হয় যে, আপনার মাথায় পাখি বসে আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সামনে তাঁর সাহাবাবর্গ এই আদব পালন করতেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৩৮৫৫নং, নাসাঈ, হাকেম ১/২০৮)*

১৭। মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় বেশী বেশী নিম্নের দুআ পড়ুন। মহানবী ﷺ এই দুআ মজলিসে প্রায় ১০০ বার পাঠ করতেন।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ۔

উচ্চারণঃ- রাব্বিগফিরলী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী মহাক্ষমাশীল। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২১)*

১৮। মজলিস শেষ হলে কাফ্ফারাতুল মাজলিসের দুআ পড়ুন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে, যাতে তার শোর-গোল বেশী হয়ে থাকে, তবে ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দুআ) বলে তবে উক্ত মজলিসে তার স্বকৃত গোনাহসমূহকে মার্জনা করা হয়। (দুআটি নিম্নরূপ)ঃ-

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ۔

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক্।'

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করছি। *(সহীহ তিরমিযী ২৭৩০ নং)*

মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে সকলের জন্য নিম্নের দুআ পড়াও সুন্নত।

اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ به بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا به جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ به عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا۔

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্‌য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-সীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল ইয়াক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাসা-ইবাদ দুন্‌য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অক্বুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজআলহুল ওয়া-রিষা মিন্না। অজআল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুসীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্‌য়্যা আকবা-রা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।

অর্থঃ - আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী ৩৪৯৭নং)*

প্রকাশ থাকে যে, মজলিস বা জালসা শেষে একজনের হাত তুলে মুনাজাত এবং সকলের 'আমীন-আমীন' বলার ঘটা শরীয়ত-সম্মত নয়; বরং এটি একটি বিদআত।

১৯। মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার সময় সালাম দিয়ে যান।

হাই ও হাঁচির আদব

আলস্যজনিত কারণে মানুষের হাই ওঠে। আর বিশেষ করে ইবাদতের সময় শয়তান মুসলিমের মনে আলস্য সৃষ্টি করে। সেই জন্য মহান আল্লাহ বান্দার হাই তোলাকে পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে শয়তান তা পছন্দ করে এবং তাতে খোশ হয়। আর সেই জন্য হাই তোলার আদব রয়েছে ইসলামে।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ এবং হাইকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি মেরে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন

প্রত্যেক সেই মুসলিমের উচিত - যে সেই হাম্দ শোনে সে যেন তার উদ্দেশ্যে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে। পক্ষান্তরে হাই হল শয়তানেরই তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে। যেহেতু তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান হাসে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন 'হা-' বলে, তখন শয়তান হাসে।" *(বুখারী ৬২২৩, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ মুখের উপর হাত রেখে নেয়। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে থাকে।" *(মুসলিম ২৯৯৫নং)*

হাই আসে অলসতা ও জড়তার কারণে। আর এ সব আসে শয়তানের কাছ থেকে। সুতরাং শয়তানের এই চক্রান্তকে যথাসাধ্য রোধ করা উচিত। তাতে শয়তান রাগান্বিত হয়। আর কেউ যখন আলস্য প্রকাশ করে 'হা-হা' বা 'হো-হো' বলে হাই তোলে, তখন শয়তান নিজের কাজের সফলতা দেখে হাসে। সুতরাং সে সময় শব্দ করে শয়তান হাসানো উচিত নয়। তাছাড়া লোকের সামনে মুখ খুলে 'হা-হা' করে হাই তুললে মুখের দুর্গন্ধ তাদের নাকে লাগতে পারে এবং তাতে আপনার প্রতি তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সুন্দর ইসলামের এই সভ্যতা বিধান।

প্রকাশ থাকে যে, হাই তোলার সময় পঠনীয় কোন দুআ নেই। এই সময় 'আঊযু বিল্লাহ---' বা 'লা হাওলা---' পড়াও বিধেয় নয়।

۞ হাঁচির সময়

পূর্বের হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, মহান আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ করেন। কারণ হাঁচিতে বান্দার কষ্টের লাঘব হয়। শ্বাসপথে আটকে থাকা শ্লেষ্মা হাঁচির ফলে পরিষ্কার হয়ে যায়। হার্টের ধমনীসমূহ অবরোধমুক্ত ও উন্মুক্ত হয়। আর সে জন্যই এর আদবে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয় এবং যেহেতু আল্লাহর রহমত না হলে হাঁচি না হওয়ার ফলে শ্বাসপথ রুদ্ধ হতে পারে অথবা একটানা সুড়সুড় করতে পারে তাই যে হাঁচির পর আল্লাহর প্রশংসা করে, তার জন্য শ্রোতাকে দুআ করতে হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২নং)*

উপরোক্ত হাদীসে এ কথাও উল্লেখ হয়েছে যে, যে হাঁচি দেবে সে সশব্দে বলবে, اَلْحَمْدُ لله 'আলহামদু লিল্লা-হ'। আর যে তার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শুনবে সে

তার জন্য দুআ করে বলবে, يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)।

অন্য এক বর্ণনা মতে হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল'ও বলা যায়। *(আবূ দাঊদ ৫০৩৩নং)* যেমন 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলাও বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৬৮৬নং)*

উল্লেখ্য যে, হাঁচির পর যদি হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার জন্য দুআ করা বিধেয় নয়। বরং আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ হাঁচলে সে যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে, তাহলে তার জন্য (দুআ করে বল,) 'য়্যারহামুকাল্লা-হ' বল। আর সে যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার জন্য (ঐ দুআ) বলো না।" *(আহমাদ ১৯১৯৭, মুসলিম ২৯৯২নং)*

অবশ্য 'হাম্দ' শুনতে না পেয়ে ঠোঁট হিলানো দেখে যদি বুঝা যায় যে, সে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছে, তাহলে তার জন্যও দুআ করতে হবে। পক্ষান্তরে 'হাম্দ' বলার জন্য হাঁচিদাতাকে স্মরণ বা উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। *(যাদুল মাআদ ২/৪৪২)*

অতঃপর যে হাঁচি দিয়েছে সে নিজের জন্য দুআ করতে শুনলে ঐ ব্যক্তির জন্যও দুআ করবে এবং বলবে,

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. (য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়ুস্‌লিহ বা-লাকুম)

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন। *(বুখারী ৭/১২৫)*

হাঁচিদাতা কাফের হলে এবং সে হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে, তার জওয়াবেও উক্ত দুআ বলতে হয়। *(আহমাদ ১৯০৮৯, আবূ দাউদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯নং)*

ইবনে উমার ﷺ-কে হাঁচির হাম্দের জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা হলে তিনি তার বদলায় 'য়্যারহামুনাল্লাহু অইয়্যাকুম, অয়্যাগফিরু লানা অলাকুম' বলতেন। *(মালেক ১৮০০, যাদুল মাআদ ২/৪৩৭)*

হাঁচির সময় মুখে হাত অথবা কাপড় রেখে যথাসম্ভব শব্দ কম করুন। যাতে মজলিসে আপনার হাঁচির শব্দে লোকেরা চমকে বা বিরক্ত না হয়ে যায় এবং আপনার নাক বা মুখ থেকে সবেগে নির্গত শ্লেষ্মা অথবা থুথু অপরের গায়ে গিয়ে না লাগে। আবূ হুরাইরা বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁচতেন, তখন নিজ হাত অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং শব্দ কম করতেন। *(আবূ দাউদ ৫০২৯, তিরমিযী ২৭৪৫নং)*

যদি কেউ একাধিকবার হাঁচে, তাহলে ৩ বারের অধিক হাঁচলে আর উত্তর দিতে হয় না। তখন তা তার সর্দির ফলে হচ্ছে বলে জানতে হবে। *(আবু দাউদ ৫০৩৪নং)*

নামাযে হাঁচলে নিম্নের দুআ পড়ুন ঃ-

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ مُبَارَكاً عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضى.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি মুবা-রাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারয়া।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা (যেমন আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।) *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৯৯২নং)*

কথাবার্তার আদব

কথাবার্তার আদব নিয়ে লিখিত পুস্তিকা 'জিভের আপদ' পড়তে অনুরোধ করে এখানে কেবল কতিপয় আদবের শিরোনাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

১। কথা বলার সময় জিভকে কাবু ও আয়ত্তে রেখে কথা বলুন। এমন কথা বলবেন না, যার ফলে আপনাকে জাহান্নাম যেতে হতে পারে।

২। কথা বললে ভালো ও উপকারী কথা বলুন, নচেৎ চুপ থাকুন। চুপ থাকাতে অনেক নিরাপত্তা আছে। অবশ্য প্রয়োজনে হক কথা বলতে চুপ থাকবেন না। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে ক্ষমতা থাকলে চুপ থাকবেন না। জেনে রাখুন যে, একটি ভালো কথা সদকার সমতুল্য। অতএব ভালো কথা বলতে কার্পণ্য করবেন না।

৩। যথাসম্ভব কম কথা বলুন। গপেদের গপবাজিতে জড়িয়ে যাবেন না। লোকেদের 'কি-কেন'-তে সময় নষ্ট করবেন না। জেনে রাখুন যে, আপনার প্রত্যেক কথা নোট করার জন্য তৎপর প্রহরী আপনার কাছেই মজুদ রয়েছেন।

৪। কারো গীবত বা পরচর্চা করবেন না। গীবত জাহান্নামের আগুন। গীবত সংসারের আগুন। গীবতকারীর জিভেও আগুন। এ সকল আগুন থেকে সাবধান হন!

৫। কারো চুগোলখোরী করবেন না বা কেউ কারো বিরুদ্ধে কথা বললে সেই কথা তার বিপক্ষকে লাগিয়ে দেবেন না। তাতেও লেলিহান আগুন আছে।

৬। কানে যা শুনবেন তাই বিবেক-বিচার না করে অপরের কাছে বলবেন না। উড়ো কথা প্রচার করবেন না। কারণ সে কথা মিথ্যা হলে, আপনিও একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেন।

৭। গুজবে থাকবেন না, গুজবে কান দেবেন না। গুজব রটাবেন না, রটা কথায় বিশ্বাস

করবেন না। সন্দিগ্ধ কথা বর্ণনা করবেন না।

৮। ঠাট্টাছলেও মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যাবাদিতা একটি কদর্য চরিত্র। মিথ্যা বলা অভ্যাস হলে আপনার সত্য কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না।

৯। কথায় কথায় গালাগালি করবেন না, অশ্লীল বলবেন না। অকথ্য বলা ভালো লোকের পরিচয় নয়। জিহ্বা দ্বারা ব্যভিচার করবেন না।

১০। আপনি হকের উপর থাকলেও তর্ক করবেন না। তর্কে মঙ্গল নেই। প্রয়োজন হলে সৌজন্য সহকারে নিয়ম-নীতি মেনে করুন।

১১। তকদীর ও কুরআন বিষয়ক কোন তর্ক-বিবাদ করবেন না। বিতর্কের সময় অশ্লীল বলবেন না।

১২। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে, হাস্য উদ্রেককর কথা বলে লোককে হাসাবার চেষ্টা করবেন না। উপহাস করতে পারেন, কিন্তু তার কথা ও বিষয় সত্য হওয়া চাই।

১৩। কথা বলার সময় আপনার থেকে বড়কে কথা বলতে দেবেন।

১৪। কেউ আপনাকে কথা বলার সময় এদিক-ওদিক তাকালে জেনে নেবেন সে কথা আপনাকে দেওয়া একটি আমানত ও ভেদ। অতএব সে আমানতের খেয়ানত এবং সে ভেদ প্রচার করবেন না।

১৫। কেউ কথা বললে, তার কথা কাটবেন না। তার কথা বলা শেষ হলে, তবে আপনি কথা বলবেন।

১৬। বড়দের মুখের উপর মুখ দেবেন না। বড়দের সাথে; যেমন ঃ আলেম ও শিক্ষকের সাথে, স্বামী ও আব্বা-আম্মার সাথে কথা বললে জোর গলায় বলবেন না।

১৭। কর্কশ ভাষায় কাউকে কথা বলবেন না। বরং নরম ও মিষ্টি করে কথা বলবেন। মহিলা বেগানার সাথে (পর্দার আড়ালে অথবা ফোনে) কথা বলার সময় এমন স্বর, সুর ও ভঙ্গিমায় বলবে না, যাতে রোগা মনের মানুষদের হৃদয়ে তার প্রতি আসক্তির অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে।

১৮। কথা বলার সময় বড় উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, সবচাইতে ঘৃণিত শব্দ হল গাধার শব্দ। *(সূরা লুকমান ১৯ আয়াত)*

১৯। কথা বলার সময় ধীরে ধীরে বলুন। তাড়াহুড়ো করে কোন কথা বলবেন না।

২০। কথায় কথায় কসম খাবেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাবেন না। ব্যবসায় কসম খাবেন না। মিথ্যা কসম খাবেন না।

২১। বিনা ইল্মে ফতোয়া দিবেন না, কোন মাসআলা বলবেন না, কোন সমাধান দেবেন না, দ্বীনের কোন দাওয়াত দেবেন না।

২২। বিপদে আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহকে আহবান করবেন না।

২৩। আপনার কথায় কোন প্রকার গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করবেন না।

২৪। কোন গণককে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করবেন না।

২৫। ছেলে-মেয়ে বা পশু-পক্ষীকে অভিশাপ করবেন না, বদ্দুআ দেবেন না।

২৬। ঝড়-বৃষ্টি, মেঘ-বন্যা, রোগ, প্রকৃতি ও যুগকে গালি দেবেন না।

২৭। বিজাতির মাবূদ এবং কারো মা-বাপকে গালি দেবেন না।

২৮। মা-বাপের কথায় 'উঃ' বলবেন না। তাঁদের জন্য নরম কথা বলবেন।

২৯। মিথ্যা অঙ্গীকার করবেন না। অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করবেন না।

৩০। স্বপ্ন বানিয়ে বলবেন না। দুঃস্বপ্ন কাউকে বলবেন না।

৩১। কাউকে অপবাদ দেবেন না। কারো চরিত্রে কলঙ্ক দেবেন না।

৩২। কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করবেন না। নিজের করা ভুল অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না।

৩৩। নিজের বা অন্য কারো ভেদ ও রহস্য প্রকাশ করবেন না।

৩৪। নিজ পাপ-রহস্য প্রকাশ ও প্রচার করবেন না।

৩৫। স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্য প্রকাশ করবেন না।

৩৬। পরস্ত্রীর সৌন্দর্য স্বামীর নিকট প্রকাশ করবেন না।

৩৭। দু' মুখে কথা বলবেন না।

৩৮। অযথা কারো কান ভাঙ্গাবেন না।

৩৯। কারো সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবেন না।

৪০। কাউকে মন্দ খেতাবে ডাকবেন না।

৪১। অশ্লীল ও বাজে গান গাইবেন না।

৪২। অশ্লীল ও বাজে কবিতা ও গজল গাইবেন না।

৪৩। মিথ্যা ঠাট-বাট ও জাঁক-জমক প্রকাশ করবেন না।

৪৪। দারিদ্রের ভান করবেন না।

৪৫। কথার মাধ্যমে নিজের সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা হারাবেন না।

৪৬। অপরের বাগ্‌দত্তাকে পয়গাম দেবেন না। অপরের কিছু ক্রয় করা দেখে তা নিজের জন্য চড়া দামে ক্রয় করবেন না। কারো ক্রেতা ভাঙ্গাবেন না।

৪৭। মহিলা হলে অকারণে স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করবেন না।

৪৮। নেতৃত্ব প্রার্থনা করবেন না।

৪৯। কাউকে অকারণে ভর্ৎসনা করবেন না ও লজ্জা দেবেন না।

৫০। পরামর্শদানে হিতাকাঙ্ক্ষী হন। কাউকে ভুল পরামর্শ দেবেন না।

৫১। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করবেন না।

৫২। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলবেন না।

৫৩। কোন মুসলিমকে খামাখা 'কাফের' বলবেন না।

৫৪। আল্লাহর উপর কসম খাবেন না।

৫৫। সবাই উৎসন্নে গেল বলে নিরাশ হবেন না।

৫৬। 'আমি স্বাধীন' বলবেন না। কারণ এ দুনিয়ায় কেউই স্বাধীন নয়। আর আপনি তো আল্লাহর দাস, স্বাধীন হবেন কোত্থেকে?

৫৭। কাফের, মুনাফেক ও মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না।

৫৮। মুনাফেককে 'স্যার' বা 'মহাশয়' বলবেন না।

৫৯। আপনার চাকর ও চাকরানীকে 'আমার দাস ও আমার দাসী' বলবেন না।

৬০। কোন বিপদের সময় 'যদি, যদি না এই করতাম--' বলবেন না।

৬১। কোন রাজাকে 'রাজাধিরাজ' বলবেন না। কারণ এ খেতাব আল্লাহর।

৬২। 'অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল' বলবেন না। কারণ বৃষ্টি আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

৬৩। কারো ক্রোধের সময় আল্লাহর স্মরণ দেবেন না।

৬৪। রঙধনুকে 'রামধনু', বড় দা-কে 'রাম দা', বড় ঝিঙেকে 'রাম ঝিঙে' বলবেন না।

৬৫। ভালো কাজে খরচ করে 'অর্থ নষ্ট হল' বলবেন না।

৬৬। কারো বংশে খোঁটা দেবেন না। নিজ বংশ নিয়ে গর্ব করবেন না।

৬৭। পরের বাপকে বাপ বলবেন না। নিজ বংশ গোপন বা অস্বীকার করবেন না।

৬৮। এতীম ও যাচ্ঞাকারীকে ধমক দেবেন না। বরং তাদের সাথে নম্র কথা বলবেন।

৬৯। পরকীয় কথায় থাকবেন না।

৭০। ধর্মীয় ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জানতে অধিক প্রশ্ন করবেন না।

৭১। কারো প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন না।

৭২। দালালি করে জিনিসের দাম বাড়াবেন না।

৭৩। একান্ত নিরুপায় না হলে যাচ্ঞা করবেন না।

৭৪। ভঙ্গিপূর্ণ কথা বলবেন না। সরল-সহজভাবে কথা বলবেন।

৭৫। কাজে না থেকে কথায় থাকবেন না; অর্থাৎ অযথা ফুটানি করবেন না।

৭৬। নিজে যা করেন না, তা অপরকে করতে বলবেন না। নিজে আদর্শ হয়ে অপরকে উপদেশ দিন।

৭৭। আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা করবেন না।

৭৮। কারো মুখোমুখি প্রশংসা করবেন না। বরং তার পিছনে প্রশংসা করুন।

৭৯। বিপদে মাতম করবেন না, অধৈর্য হবেন না। বিপদ ও অশান্তির সময় মৃত্যু প্রার্থনা করবেন না।

৮০। ক্রোধের সময় কথা বলবেন না। প্রকৃতিস্থ হয়ে কথা বলুন, কথার উত্তর দিন।

৮১। উপদেশ গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবেন না। বড়-ছোট সকল উপদেষ্টার নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন।

৮২। কথায় কথায় কারো ভুল ধরবেন না।

৮৩। অন্যায় সুপারিশ করবেন না।

৮৪। মসজিদে সাংসারিক গল্প-গুজব করবেন না। আল্লাহর ঘরে আল্লাহরই কথা বলবেন।

৮৫। কাউকে অন্যায়ের পথ বলবেন না।

৮৬। নিজের বাধ্য মানুষকে (স্ত্রী ও সন্তানকে) অবৈধ কাজে অনুমতি দেবেন না।

৮৭। অন্যায় ও অসঙ্গত কথা বলবেন না।

৮৮। যখন কথা বলবেন, তখন লক্ষ্যহীনভাবে কথা বলবেন না। আপনার কথা বলার পশ্চাতে যেন উত্তম লক্ষ্য থাকে।

৮৯। আপনার কথায় যেন এমন ভাব ও ভাষা না থাকে, যা শুনে লোকের মনে হয় যে, আপনি নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করার জন্য দাঁতভাঙ্গা অবোধগম্য বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করছেন।

৯০। আপনার জবানে আল্লাহর যিক্রই বেশী করুন।

আল্লাহর দেওয়া জিভকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ ﴾ (الأحزاب ٧٠)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহযাব ৭০ আয়াত)*

আর সাবধান! আপনার প্রত্যেক কথা কিন্তু ফিরিশ্তা নোট (টেপ) করে রাখছেন।

শয়ন ও নিদ্রার আদব

নিদ্রা আল্লাহর দেওয়া মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا ٩ ﴾ (النبأ ٩)

অর্থাৎ, তোমাদের নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্য। *(সূরা নাবা ৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে নিদ্রা অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبۡتِغَآؤُكُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ ﴾ (الروم ٢٣)

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হল, রাত্রে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ। *(সূরা রূম ২৩ আয়াত)*

ঘুমের এই স্বাদ ঘুমের আগে, পরে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় অনুভূত হয়। ঘুমের মাঝেই মানুষ তার কর্মশক্তি পুনরায় নতুন ও সতেজভাবে ফিরিয়ে পায়।

ঘুম হল মৃত্যুর ভাই। তাই ঘুমের আগে এমন কিছু পালনীয় আদব আছে, যা পালন করলে মানুষ নিরাপদে রাত্রিযাপন করতে পারে। সেই সকল আদব নিম্নরূপ ঃ-

১। শোবার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলে বাড়ির দরজাসমূহ বন্ধ করে দিন। এতে আপনার জন্য পর্দা এবং শয়তান ও মানুষ থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "সন্ধ্যা হলে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ ঐ সময় শয়তানদল ছড়িয়ে পরে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (শয়নকালে) সমস্ত দরজা অর্গলবদ্ধ কর এবং (সেই সাথে) আল্লাহর নামের স্মরণ নাও। আর আল্লাহর নামের স্মরণ নিয়ে বিভিন্ন (পাত্র-আধার ও) বাসনাদি ঢেকে রাখ। ঢাকার কিছু না থাকলে অন্ততঃপক্ষে একটি কাষ্টখন্ড (বা অন্য কিছু) দ্বারা ঢাকো। আর (বিশেষ করে তৈল-জ্বালিত) বাতিসমূদয় নির্বাপিত কর।" *(বুখারী ৬২৯৬, মুসলিম ২০১২নং, প্রমুখ)* কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলে না, কোন আবৃত পাত্রও খুলে না এবং ইঁদুর (তৈল জ্বালিত প্রদীপ দ্বারা) গৃহবাসীর উপর তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দেয়।" *(বুখারী ২০১২, ৬২৫৯নং)*

(শীতের রাতে ধুনি অথবা বাতি জ্বালিয়ে রেখে অথবা উননে বা গোয়ালে ধুঁয়া দিয়ে) "তোমরা ঘুমাবার সময় আগুন ছেড়ে রেখো না।" *(বুখারী ৬২৯৩, মুসলিম ২০১৫নং প্রমুখ)*

২। বিছানায় যাওয়ার আগে ওযূ করে নেওয়া মুস্তাহাব। এ কাজের ফযীলত রয়েছে বিরাট। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশ্তাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশ্তা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

তিনি আরো বলেন, যে কোনও মুসলিম যখনই ওযু অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, অতঃপর রাত্রিতে (সবাক) জেগে উঠে ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তখনই আল্লাহ তাকে তা প্রদান করে থাকেন।" *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৫নং)*

অবশ্য আগে ওযূ থাকলে এবং তা নবায়ন না করলেও ঐ ফযীলত পাওয়া যাবে

ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া ওযূ অবস্থায় ঘুমালে শয়তানের তামাশা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা সম্ভব হবে।

৩। বিছানায় গিয়ে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিন। বিছানা তুলে ঝাড়াই উত্তম। যেহেতু বিছানা বা তার চাদরের নিচে সাপ-বিছা বা অন্য কোন পোকা-মাকড় থাকলে তাও দূর হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী ﷺ উম্মতকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন। *(বুখারী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসলিম ২৭১৪নং প্রমুখ)*

৪। বিছানায় দেহ রেখে ডান কাতে শুয়ে যান এবং ডান গালকে ডান হাতের উপর রাখেন। মহানবী ﷺ নিজে এই আমল করেছেন এবং উম্মতকে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(আহমাদ ২২৭৩৩, বুখারী ২৪৭, ৬৩১৪, মুসলিম ২৭১০নং)*

যেহেতু এইভাবে শোওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ফলপ্রসূ।

৫। এরপর আয়াতুল কুরসী পড়ুন। আল্লাহর তরফ থেকে দেহরক্ষী পাবেন এবং রাতে আপনার কাছে শয়তান আসবে না। *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

৬। সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করুন। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাকা্বার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।" *(বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)*

কোন কোন বর্ণনায় আছে, ঐ দুই আয়াত বাড়িতে তিন রাত পাঠ করলে শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হবে না অথবা তা (একবার) পাঠ করলে তিন রাত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হবে না। *(সহীহ তারগীব ১৪৬৭নং)*

৭। দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে, সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে যথাসম্ভব সারা দেহে বুলিয়ে নিন। এমনটি ৩ বার করতে হয়। *(বুখারী ৫০১৭, মুসলিম ৪/১৭২৩)*

অবশিষ্ট আরো দুআ 'দুআ ও যিক্‌র' পুস্তিকায় দেখে নিন।

এই হল ঘর বন্ধ করার আসল পদ্ধতি। অন্যথা ভাড়াটিয়া ওঝা এনে কয়েক ঘন্টার মত কুরআন অথবা মন্ত্র পড়ে ঘরের চার কোণে শির্কী মাটির ভাঁড় পুঁতে, বাঁশের ডগায় আয়না বেঁধে, দরজায় দরজায় শির্কী তাবীয চিটিয়ে ঘর বন্ধ হয় না। বরং তাতে শয়তানের জন্য যাতায়াতের দরজা বেশী করে খোলা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, রাতে সূরা ওয়াকিআহ পাঠ করার বা তা পাঠ করলে উপোস বা অভাব স্পর্শ না করার হাদীস সহীহ নয়।

৮। সম্ভব হলে ঘুমাবার আগে সূরা মুল্‌ক, সাজদাহ, বানী ইসরাঈল, যুমার এবং আদিতে তাসবিহবিশিষ্ট সূরা পাঠ করুন।

৯। সম্ভব হলে কোন ঘরে একাকী শোবেন না। কারণ মহানবী ﷺ একাকী রাত্রিবাস ও একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬০নং)*

১০। দুই জন শুলে এক বিছানায় একটি ঢাকা বা একটি লেপ-কম্বলে শুবেন না। পরনে কাপড় না থাকলে এক ঢাকায় ২ জন শোয়া হারাম। যেহেতু মহানবী ﷺ মহিলার সাথে মহিলাকে এবং পুরুষের সাথে পুরুষকে এভাবে শুতে নিষেধ করেছেন। *(শারহুন নওবী ৪/৩০, আউনুল মা'বূদ ১১/৪০)* অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর কথা ভিন্ন।

১১। পায়ের উপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুবেন না। বিশেষ করে শরমগাহ বের হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, লুঙ্গি পরে একটি পা খাড়া রেখে হাঁটুর উপর অপর পা-টিকে চাপিয়ে শুবেন না। কেননা, পায়ের উপর পা চাপিয়ে শুতে আল্লাহর নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। *(আহমাদ ১৩৭৬৬, মুসলিম ২০৯৯, তিরমিযী ২৭৬৭নং)*

অবশ্য শরমগাহ বের হওয়ার ভয় মোটেই না থাকলে পা দুটিকে লম্বালম্বিভাবে বিছানায় ফেলে রেখে একটিকে অপরটির উপরে চাপিয়ে রেখে শোওয়া হারাম নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ কখনো কখনো পায়ের উপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছেন। *(বুখারী ৫৯৬৯, মুসলিম ২১০০নং প্রমুখ)* খলীফা উমার ও উষমানও এইভাবে শুয়েছেন। *(বুখারী ৪৭৫নং)*

১২। কিবলার দিকে পা করে শোওয়া হারাম নয়। যেহেতু তা হারাম হওয়ার কোন দলীল নেই।

১৩। উবুড় হয়ে শুবেন না। একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, "এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ পছন্দ করেন না।" *(আহমাদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

১৪। এমন ছাদে শুবেন না, যার বাঁধ অথবা দেওয়াল নেই। যেহেতু ঘুমের ঘোরে অথবা কোন শব্দ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন ঘরের ছাদে রাত্রিযাপন করে, যার কোন আড়াল নেই, সে ব্যক্তির উপর থেকে (নিরাপত্তার) দায়িত্ব উঠে যায়।" *(আহমাদ ২০২২৫, আল-আদাবুল মুফরাদ ১১৯২, আবূ দাউদ ৫০৪১নং)*

১৫। রাত্রে খারাপ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে বাম দিকে তিনবার থুথু মারুন, শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চান, যে দুঃস্বপ্ন দেখেন, সেই মন্দ ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা প্রার্থনা করুন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করুন। ভয়ে ঘুম না এলে উঠে নামায পড়তে শুরু করুন। *(বুখারী ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১-২২৬৩নং)*

খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবেন না। অবশ্য সুস্বপ্ন হলে আত্মীয়-বন্ধুকে বলতে পারেন। *(মুসলিম ২২৬১)*

১৬। ঘুম থেকে জাগার পর আল্লাহর নির্দিষ্ট যিক্র পড়ুন।

দাস-দাসীর সাথে ব্যবহার

পারতপক্ষে বাড়িতে দাস-দাসী ব্যবহার না করাই উত্তম। যেহেতু দাস-দাসী দ্বারা উপকার নিতে গিয়ে অনেক সময় অনেকের অপকারই বেশী হয়ে থাকে। *(এ বিষয়ে 'আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ' দ্রষ্টব্য)*

তবুও প্রয়োজনে যাঁরা দাস-দাসী ব্যবহার করবেন, তাঁদের উচিত হবে, ইসলামী আদব খেয়াল রাখা।

১। কাজের লোক রাখুন দুটি গুণ দেখে; সে যেন কর্মঠ হয় এবং আমানতদার হয়। মহান আল্লাহ নবী শুআইব ﷺ-এর এক কন্যার কথা উল্লেখ করে বলেন,

((إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ)) (٢٦) سورة القصص

অর্থাৎ, তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। *(সূরা ক্বাসাস ২৬ আয়াত)*

২। খাদেম, কর্মচারী, ভৃত্য বা দাসীকে মাসের মাস যথাসময়ে বেতন মিটিয়ে দিন। নচেৎ যথাসময়ে বেতন না পেয়ে সে বা তার পরিবার যদি অর্থনৈতিক কষ্টে ভোগে এবং আপনার কাজের ক্ষতি হয়, তাহলে তার জন্য দায়ী আপনিই। মজুর হলে তার মেহনতের ঘাম শুকাবার আগে আগেই তার মজুরী আদায় করে দিন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর খাজাঞ্চী তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" *(সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

৩। খবরদার কাজ করিয়ে কারো বেতন, পরিশ্রম করিয়ে কারো পারিশ্রমিক, ভাড়া খাটিয়ে কারো ভাড়া আত্মসাৎ করবেন না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামাকা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

রাহমাতুল লিল-আলামীন ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।” *(বুখারী ২২২৭,২২৭০নং)*

৪। দাস-দাসীকে বিনা দলীলে কোন অপবাদ দেবেন না। আদেশ ও কথায় কষ্ট দেবেন না।

তওবার নবী আবুল কাসেম ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে কিছুর অপবাদ দেয় -অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র- সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।” *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০ নং, তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

৫। খাদেম বা ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যদি আপনি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যে শ্রেণীর খান ও পরেন তাকেও সেই শ্রেণীর খেতে ও পরতে দিন।

৬। আপনার গোলাম বা বাঁদীকে এমন কাজের ভার দিবেন না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। যদি দিতেই হয়, তাহলে আপনি গোলামের সহযোগিতা করুন এবং আপনার বাড়ির কোন মহিলা বাঁদীর সহযোগিতা করুক।

মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ﵁-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র ﵁ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, “হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!” অতঃপর তিনি বললেন, “ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনমত হবে না তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।” *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আবূ যার্র ﵁-কে বলেছিলেন,

"নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।" আবূ যার্র বললেন, 'আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।" *(বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১নং)*

৭। আপনি যেমন ভুল করেন, ঠিক তেমনই দাস-দাসীরও কার্যক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে। সুতরাং আপনি যেমন চান, আপনার ভুল ক্ষমার্হ হোক, ঠিক তেমনই দাস-দাসীর ভুলকেও ক্ষমা করে দিন।

এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চাকরকে কতবার ক্ষমা করব? উত্তরে তিনি বললেন, "প্রত্যহ ৭০ বার।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ২২৮৯নং)*

৮। আপনার খানা যদি খাদেম প্রস্তুত করে, তাহলে সেই খাবারে খাদেমকেও শরীক করুন। যেহেতু সে ঐ খাবারের পিছনে মেহনত করেছে, তার সুগন্ধ তার পেটে গেছে এবং হয়তো বা তার মন ঐ খাবারের প্রতি লোভাতুর হয়েছে। এই জন্যই দয়ার নবীর নির্দেশ হল, তাকে বসিয়ে এক সাথে খান। আর তাকে বসানো যদি সম্ভব না হয় বা সে বসতে না চায়, তাহলে সেই খাবার হতে কিছু অংশ তুলে তাকে দিয়ে খান। *(বুখারী ৫৪৬০, মুসলিম ১৬৬৩নং)*

৯। দাসীর ব্যাপারে আপনি ও আপনার বাড়ির পুরুষরা সতর্ক হন। জেনে রাখুন যে, তার সাথে বাড়ির পুরুষের অবাধ মিলামিশা, নির্জনতা অবলম্বন এবং বেপর্দায় খিদমত গ্রহণ বৈধ নয়। তদনুরূপ বাড়ির ভৃত্য ও ড্রাইভারের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যাতে আপনার বাড়ির কোন মহিলার সাথে তার কোন প্রকার গোপন সম্পর্ক গড়ে না ওঠে। *(এ বিষয়ে 'আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ' দ্রষ্টব্য)*

১০। বিশেষ উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপঢৌকন দিন। তাতে তারা আপনার কাজে আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে। আপনার খাদেম বা লেবারকে কাজের তুলনায় বেশী বেতন দেওয়া হচ্ছে মনে হলে তাতে সওয়াবের আশা রাখুন। ঈদ ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপহার দিন, বোনাস দিন। বেতন কম দিলেও দেখবেন তাতে আপনার উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাফেরের সাথে ব্যবহার

আপনি এমন সমাজে বাস করতে বাধ্য হতে পারেন, যেখানে মুশরিক ও কাফের বসবাস করে। অতএব তাদের সাথে যে আদব খেয়াল রাখা দরকার তা নিম্নরূপঃ-

১। সম্ভব হলে সেখান থেকে হিজরত করে মুসলিম পরিবেশে চলে যান। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দেশে বাস করবে, তার নিকট থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যাবে।" *(সহীহুল জামে' ২৭১৮-নং)*

"তোমরা মুশরিকদের সাথে বসবাস করো না এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করো না। সুতরাং যে তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা সহাবস্থান করবে, সে তাদেরই মত।" *(তিরমিযী ১৬০৫নং)*

"কোন মুশরিকের ইসলাম আনার পর আল্লাহ তার আমল ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদেরকে বর্জন করে মুসলিমদের মাঝে (হিজরত করে) গেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৫৩৬নং)*

২। হিজরত করা সম্ভব না হলে কুফ্র ও শির্কের মাঝে আপনার ঈমান বাঁচাতে শরয়ী আদব মেনে চলুন এবং জেনে রাখুন যে, মানবজাতির জন্য একমাত্র ইসলামই হল আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম পালন করে মানুষের পরিত্রাণ নেই। সুতরাং ইসলামকে যারা অস্বীকার করে, তারা নামে মুসলিম হলেও কাফের।

৩। কাফেরদের ধর্ম ইসলাম আসার পর বাতিল হয়ে গেছে -এ কথা মনে রাখবেন।

৪। কাফেরকে হেদায়াতের আলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এমন ব্যবহার প্রদর্শন করবেন, যাতে সে আপনার ও আপনার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খবরদার এমন ব্যবহার প্রদর্শন করবেন না, যার ফলে সে ইসলামকে ঘৃণা করে অথবা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। যেহেতু ইসলাম সত্য ও সুন্দর। অতএব আপনার নোংরা ব্যবহার দ্বারা সেই সত্য ও সুন্দরকে মলিন করবেন না।

আপনি এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনের মালিক হতে চাইলে একটি কাফেরকে ইসলামের পথ দেখান।

৫। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু, তারা আপনার বন্ধু হতে পারে না। অতএব যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে, আপনি তাদেরকে ভালোবাসুন এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ঘৃণা করে, আপনি তাদেরকে ঘৃণা করুন।

৬। কোন কাফেরের সাথে অসদ্ব্যবহার করবেন না, কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٨) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে তোমাদেরকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা মুমতাহিনাহ ৮ আয়াত)*

৭। কাফের হলেও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন যিনি আকাশে আছেন।" *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪১৩২ নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।" *(বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ২৩১৯ নং, তিরমিযী)*

তিনি আরো বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

৮। কাফের হলেও তার প্রতি যুলম করা যাবে না, তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না। আপনি আপনার আচরণ ও ব্যবহারে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "শোন! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিমের) প্রতি যুলম করবে অথবা তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করবে না অথবা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কর্মভার চাপিয়ে দেবে অথবা তার সম্মতি বিনা তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতিবাদী হব।" *(আবূ দাঊদ ৩০৫২নং)*

৯। কাফেরদের বাতিল মা'বূদকে গালি দেওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ))(١٠٨)

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের (উপাসনা) আহবান করে তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা অন্যায়ভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে। *(সূরা আনআম ১০৮)*

নবী করীম ﷺ বলেন, 'কাফেরকে গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দিও না।' *(সহীহুল জামে' ৭০৬৮)*

১০। কোন অমুসলিমকে খামাখা গালাগালি ও বদ্দুআ করবেন না। যেহেতু আবূ হুরাইরা বলেন, বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের উপর বদ্দুআ করুন।' তিনি বললেন, "আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, বরং আমি কেবল রহমত (করুণা)রূপে প্রেরিত হয়েছি।" *(মুসলিম ২৫৯৯নং)*

১১। কাফের সমাজে বাস করলে কোন কাজে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন না। প্রত্যেক কাজে যেন আপনার পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদেরকে ছেড়ে অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং)*

"যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

১২। বিশেষ করে ইবাদতের ক্ষেত্রে একাকার হওয়া থেকে সাবধান হন। আর মহান আল্লাহর শিখানো সূরা কাফেরূন পাঠ করে তার উপর আমল করুন। মহান আল্লাহ বলেন, "বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।"

১৩। কাফেরকে আগে সালাম দিবেন না। সে আপনাকে সালাম দিলে তার উত্তর দিবেন। *(সালামের আদব দ্রঃ)*

১৪। কাফের হাঁচি দিলে তার জন্য দুআ করে বলতে পারেন,

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. (য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়্যুসলিহ বা-লাকুম)

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন। *(বুখারী ৭/ ১২৫)*

১৫। কাফেরের উপঢৌকন ও উপহার প্রদানে ও গ্রহণে যদি ইসলামী দাওয়াতের কোন উপকার থাকে তাহলে তা প্রদান ও গ্রহণ করতে পারেন। তদনুরূপ গ্রহণ না করাতে কোন উপকার বুঝলে তা গ্রহণ নাও করতে পারেন। তাদের কাচা কাপড় তাদের তৈরী করা হালাল খাবার আপনি খেতে পারেন। তাদের বৈধ দাওয়াতে বৈধ খাবারও মহান উদ্দেশ্যে খেতে পারেন। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াহুদীদের দাওয়াতও খেয়েছেন।

১৬। কাফেরদের হোটেল ও পাত্রে খাওয়া বৈধ নয়। অবশ্য তাদের হোটেল ও পাত্র

ছাড়া অন্য পাত্র না পাওয়া গেলে তা ভালোরূপে ধুয়ে তাতে খাওয়া যায়।

১৭। আপনার সকল কাজে এবং বিশেষ করে বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে রাখবেন। তিনি বলেন,

(وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (٢٢١)

অর্থাৎ, আর মুশরিক রমণী যে পর্যন্ত মুসলমান না হয় তোমরা তাকে বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদের পছন্দ হলেও নিশ্চয়ই মুসলিম ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। আর মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে কন্যার বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের পছন্দ হলেও মুসলিম ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।" *(সূরা বাকারাহ ২২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "মু'মিন নারীগণ কাফের পুরুষদের জন্য এবং কাফের পুরুষরা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।" *(সূরা মুমতাহিনাহ ১০ আয়াত)*

১৮। অবশ্য সঙ্গত কারণে বিশেষ করে মহান উদ্দেশ্য সাধন করার মানসে আপনি কোন ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান সতী নারীকে মোহর দিয়ে বিবাহ করতে পারেন।

পশু-পক্ষীর প্রতি ব্যবহার

ইসলাম শান্তির ধর্ম, রহমতের ধর্ম। এ ধর্মে কেউ অত্যাচারের শিকার হয় না। মানুষ তো নয়ই, এমনকি জীব-জন্তুও নয়। জীবে-দয়া প্রদর্শন করতে আদিষ্ট হয়েছে প্রত্যেক মুসলিম। সুতরাং পশু-পক্ষীর প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম তা আমাদের জানা প্রয়োজনঃ-

১। সৌন্দর্যের জন্য কোন পাখীকে পিঞ্জারায় বা মাছকে পানির হওয বা কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ করতে পারেন। তবে শর্ত হল, যেন তার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না করা হয়; যথাসময়ে পানাহার করতে দেওয়া হয় এবং তার প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন করা হয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১১৯৮-পৃঃ)*

২। গৃহপালিত অথবা পিঞ্জারাবদ্ধ পশু বা পক্ষী হলে তাকে নিয়মিত পানাহার করতে দিতে হবে। তা না দিলে এবং তার ফলে সে মারা গেলে গোনাহগার হতে হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে; যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেওয়া হয়েছে; যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি ও পান করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ (গঙ্গাফড়িং) ধরে খেত।” *(বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২নং)*

একদা মহানবী ﷺ একটি উঁটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, “তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।” *(আবূ দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)*

এক ব্যক্তি তার উঁটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী ﷺ-কে পার হতে দেখে উঁটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উঁটের মালিককে ডেকে বললেন, “তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ভুখা রাখ এবং কষ্ট দাও!” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)*

৩। এমনকি পালিত না হলেও ছাড়া পশু-পক্ষীরও যদি পানাহার বিনা মরতে বসে, তাহলে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাকে পানাহার করিয়ে বাঁচিয়ে তোলা বড় সওয়াবের কাজ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।”

লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, “প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।” *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

তিনি বলেন, “দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয়

না।” *(আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৭৪৬৭নং)*
তিনি এক সাহাবীকে বলেন, “তুমি যদি তোমার বকরীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।” *(হাকেম, সহীহ তারগীব ২২৬৪নং)*

৪। বৈধ নয় খামাখা কোন পশু-পক্ষীকে কষ্ট দেওয়া, সাধ্যের অতীত কোন পশুকে বোঝা বহনে বাধ্য করতে মারধর করা। হালাল নয় পশু-পক্ষী কিছু অনিষ্ট করে ফেললে, গরু-মহিষ গাড়ি বা হাল টানতে অক্ষম হয়ে পড়লে অতিরিক্ত প্রহার করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া।
একদা ইবনে উমার ﷺ কুরাইশের একদল তরুণের নিকট বেয়ে পার হয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলেন; সে সময় তারা একটি পাখি অথবা মুরগীকে বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুঁড়ে হাতের নিশান ঠিক করা শিক্ষা করছিল। আর (মুরগী বা) পাখি-ওয়ালার সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, যে তীর লক্ষ্যচ্যুত হবে সে তীর তার হয়ে যাবে। ওরা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, ‘কে এ কাজ করেছে? যে এ কাজ করেছে আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন। অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮ নং)*
একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ বেয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, “আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন, যে একে দেগেছে।” *(মুসলিম ২১১৬নং)* তিনি পশুর চেহারায় দাগতে ও মারতে নিষেধ করেছেন। *(ঐ)*

৫। পশু-পক্ষী কিছু অনিষ্ট করে ফেললে, গরু-মহিষ গাড়ি বা হাল টানতে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদেরকে অকথ্য গালি এবং ইচ্ছামত শাপ দিয়ে পাপ করবেন না।
এক সফরে আনসারদের এক মহিলা তার সওয়ারী উষ্ট্রীকে অভিশাপ বা গালি দিলে নবী ﷺ বলেন, “ওর পিঠে যা আছে তা নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও, কারণ ও অভিশপ্তা।” *(মুসলিম)*
এক দাসী তার সওয়ারী উষ্ট্রীকে বলল, ‘ধুৎ, আল্লাহ একে অভিশাপ দাও!’ নবী ﷺ এ কথা শুনে বললেন, ‘অভিশপ্তা উষ্ট্রী যেন আমাদের সঙ্গে না আসে।’ *(ঐ)*

৬। উঁট, ঘোড়া বা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে কোথাও যাওয়া ছাড়া তার পিঠে খামাখা বসে থেকে কষ্ট দেবেন না, তার পিঠে চড়ে কোন কাজ করবেন না। তদনুরূপ গরু বা মহিষের কাঁধে গাড়ির জোঁয়াল রেখে কোন কাজ করবেন না। যেহেতু দয়ার নবী ﷺ সওয়ারীর পিঠকে মিম্বর বানাতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২নং)*

৭। কোন হারাম পশু-পাখী অথবা খাওয়ার ইচ্ছা ছাড়া কোন হালাল পশু-পাখী খামাখা

হত্যা করবেন না। পাখীর ছানা ধরে বাচ্চাদেরকে খেলতে দেবেন না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামাকা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশী চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।" বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! অধিকারটা কি (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, "অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে তা খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।" *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৬৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি নিজ প্রয়োজনে (সরে) গেলে আমরা 'হুম্মারাহ' (নামক লাল রঙের চড়ুই জাতীয় একটি) পাখী দেখলাম। তার সাথে ছিল তার দুটি ছানা। আমরা সেই ছানা দুটিকে নিয়ে ফেললাম। পাখীটি আমাদের মাথার উপরে ঘুরে-ফিরে উড়তে লাগল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এসে তা দেখে বললেন, "কে ওকে ওর ছানা নিয়ে কষ্ট দিয়েছে? ওর ছানা ওকে ফিরিয়ে দাও।" একদা তিনি দেখলেন, পিঁপড়ের গর্তসমূহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি তা দেখে বললেন, "কে এই (পিঁপড়েগুলি)কে পুড়িয়ে ফেলেছে?" আমরা বললাম, 'আমরাই।' তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আর অন্য কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাঊদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫নং)*

একদা একটি গাছের নিচে একজন নবীকে পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তিনি গর্তসহ পিঁপড়ের দল পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁকে অহী করে বললেন, "তোমাকে একটি পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তুমি একটি এমন জাতিকে পুড়িয়ে মারলে, যে (আমার) তসবীহ পাঠ করত? তুমি মারলে তো একটিকেই মারলে না কেন, (যে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল)?" *(বুখারী, মুসলিম ২২৪১নং প্রমুখ)*

৮। অবশ্য যে প্রাণী মানুষের ক্ষতি করতে পারে, তাকে হত্যা করায় দোষ নেই। বরং আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তাকে মেরে ফেলা ওয়াজেব। বরং অনেক প্রাণী মেরে ফেলাতে শরীয়ত নির্দিষ্ট সওয়াবও ঘোষণা করেছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে ইহরাম ও হালাল অবস্থায় (অথবা হারাম সীমানার ভিতরে ও তার বাইরে) হত্যা করা হবে; সাপ (বিছা), (পিঠে অথবা বুকে

সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।” *(মুসলিম, মিশকাত ২৬৯৯নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।” *(মুসলিম ২২৪০ নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কোন (বিষধর) সাপ দেখে এবং তার হামলার ভয়ে তাকে মেরে না ফেলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(সহীহুল জামে' ৬২৪৭নং)*

৯। এমন কি হালাল পশু যবাই করার সময়ও ইসলাম আমাদেরকে যবাই-এর পশুর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে বলেছে।

মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।” *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

এই দয়া প্রদর্শন করতে গিয়েই বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মকরূহ)। যেহেতু নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।” *(মুসনাদ আহমাদ ২/ ১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, সহীহ তারগীব ১/৫২৯)*

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম হল দয়া ও রহমতের ধর্ম। আমাদের প্রতিপালক পরম দয়াবান, আমাদের নবী দয়াবান এবং মুসলিমরা আপোসেও একে অন্যের প্রতি দয়াবান। আর পরম দয়াবান আল্লাহ দয়াবান মানুষকে দয়া করে থাকেন।

১০। আপনার পশুতে যদি আল্লাহর হক থাকে, তাহলে তা আদায় করতে ভুলবেন না।

১১। পশু নিয়ে আল্লাহর যিকরে উদাসীন হবেন না। বিশেষ করে যদি ঘোড়া পেলে থাকেন, তাহলে শরীয়তের নির্দেশ ভুলে যাবেন না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে

আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

১২। যদি পারেন, তাহলে আপনার পশু দ্বারা সওয়াব অর্জন করুন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শোনো! কোন ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন দুধাল পশু দুধ খাওয়ার জন্য (কিছুকাল অবধি) ধার দেয়; যে সকালে এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায়ও এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় তবে তার সওয়াব অবশ্যই খুব বড়।" *(মুসলিম ১০১৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "যে কোন দুগ্ধবতী পশু কাউকে দুধ খেতে ধার দেয়, তবে ঐ পশু (তার জন্য) সকালে সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয় এবং সন্ধ্যাতেও সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয়; সকালে সকালের পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যার পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে (ঐ সদকাহ্‌র সওয়াব লাভ হয়)।" *(মুসলিম ১০২০ নং)*

১৩। আপনার অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য বাড়িতে ছাগল-ভেঁড়া পালতে পারেন।

মহানবী ﷺ উম্মে হানী رضي الله عنها কে বলেছিলেন, "বাড়িতে ছাগল পাল। কারণ তাতে বর্কত আছে।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭৩ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "উঁট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেঁড়া-ছাগল হল বর্কত। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৩ নং)*

জেনে রাখুন যে, বকরী চড়ানো সকল নবীর সুন্নত।

আল্লাহভক্ত একজন আবেদের প্রাত্যহিক আমল

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ঘুম থেকে জেগে উঠে দুআ পড়ুন।
পেশাব-পায়খানার দরকার হলে সারুন।
দাঁতন করুন।
গোসলের দরকার হলে গোসল নতুবা ওযূ করুন।
তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়ুন।
তাহাজ্জুদ পড়ুন।
আযান শুনে আযানের জবাব দিন।
আযানের পর ফজরের সুন্নত পড়ুন।
ফজরের পর ডানকাতে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিন। তবে অবশ্যই ঘুমিয়ে যাবেন না।
আযান হলে জামাআতে নামায পড়তে মসজিদে যান।
মসজিদে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান করার নানান আদব খেয়াল রাখুন।
ফরয নামাযের ইকামত হলে সুন্নত ত্যাগ করে ফরয নামায পড়ুন।
নামাযের পর যথানিয়মে যিক্র পড়ুন।
ফজরের নামায পড়ে সূর্য ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে তেলাঅত ও যিক্র করুন। তার সওয়াব অনেক। ইল্মী মজলিস থাকলে সেখানে বসুন।
সকালের যিক্র-আযকার পড়ুন। *(দুআ ও যিক্র দ্রষ্টব্য)*

প্রকাশ থাকে যে, সকালে ৭০ হাজার ফিরিশ্তার দুআ এবং ঐ দিনে মরলে শহীদের দর্জা পাওয়ার জন্য সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করার হাদীস সহীহ নয়। *(দ্রঃ যয়ীফ তারগীব ৩৭৯, যয়ীফুল জামে' ৫৭৩২নং)*

ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত (ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নত বা কারণ-ঘটিত কোন নামায ছাড়া) সাধারণ কোন নফল নামায পড়া যাবে না। যেমন সূর্য ওঠা, ডোবা ও ঠিক মাথার উপর থাকার সময় নফল নামায নিষিদ্ধ।

প্রয়োজনে ফজরের পর ঘুমাতে পারেন। তবে উদাসীন ও অলসদের মত খামাখা বিলাস-নিদ্রায় পড়ে থাকা উচিত নয়। বরং কাজ থাকলে সকাল-সকালই সেরে ফেলা কর্তব্য।

অবশ্য "সকালের ঘুম রুযী থেকে বঞ্চিত করে।" এ হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফুল জামে' ৩৫৩১নং)* যেমন "সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে

মানুষের রুযী বন্টন করা হয়” এ মর্মে নবী-দুলালী ফাতিমার হাদীসটি মউযূ' বা জাল। *(দেখুনঃ যয়ীফ তারগীব ১০৪৭নং)*

সূর্য ওঠার পর ইশরাকের নামায পড়ুন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।” বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।” অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকরকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকরকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ৪৬২নং)*

নাস্তার সময় খাওয়ার আদব মনে রাখুন।

পোশাক পরার সময় তার পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার আদব মনে রাখুন।

ঘর থেকে বের হওয়ার আদব এবং সফর, সাক্ষাৎ, যিয়ারত ও যিয়াফতের আদব খেয়াল রাখুন।

যে কাজেই যান ইসলামের বিধান ভুলে যাবেন না।

ঘরে থাকলে চাশ্তের সময় চাশ্তের নামায পড়ুন।

যাওয়ালের পূর্বে যাওয়ালের নামায পড়ুন। যাওয়ালের পরেও ৪ রাকআত পড়ুন।

যোহরের সময় যোহরের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করুন।

দুপুরের খাবারের সময় খাবারের আদব খেয়াল করুন।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, “তোমরা দুপুরের সময় বিশ্রাম নাও। শয়তানরা এ সময় বিশ্রাম নেয় না।” *(ত্বাবারানী, আবূ নুআইম, সহীহুল জামে' ৪৪৩ নং)*

এই বিশ্রাম ও বিরতির ফলে দেহ-মন তরতাজা হয়ে উঠবে। নতুনভাবে কাজ ও ইবাদতে মন বসবে। রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সহজ হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সামান্য দিবানিদ্রা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

আসরের সময় আসরের নামায মসজিদে গিয়ে পড়ুন।

আসরের আগে ৪ রাকআত সুন্নত পড়ুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করবেন।

আসরের ফরয নামাযের পর (কারণ-ঘটিত কোন নামায ছাড়া) আর কোন নফল নামায নেই।

আসরের নামাযের পর বসে তেলাঅত ও যিক্র করুন। ইল্মী মজলিসে বসুন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকরকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ৪৬২নং)*

আসরের পর ক্লান্ত থাকলে অথবা বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হলে আপনি ঘুমাতে পারেন। এ সময় ঘুম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অথবা ঘুমালে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতে পারে বলে যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৯নং)*

মাগরেবের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করুন।

ইচ্ছা হলে ও সময় থাকলে মাগরেবের ফরযের আগে ২ রাকআত নামায পড়ুন।

সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়ার চেষ্টা করুন।

মাগরেবের সুন্নতের পর আর নির্দিষ্ট কোন নফল নামায নেই।

এশার আযান হলে জামাআতে এশার নামায পড়ুন। সুন্নত পড়ে বাড়ি ফিরে রাতের খানা খেয়ে বেশী রাত না জেগে যথাসম্ভব আগে আগে ঘুমিয়ে যান। যাতে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠতে আপনার কষ্ট না হয়। আর কোন বৈধ কারণবশতঃ রাত হয়েই গেলে ওযূ করে ২/৪ রাকআত নামায পড়ে বিত্র পড়ে শুয়ে যান।

পক্ষান্তরে রাতে উঠতে পারবেন না -এই আশঙ্কা হলে এশার সুন্নতের পরে বিত্র পড়ে নিন।

আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এশার আগে ঘুমাতে এবং পরে (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯১৫নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এশার নামাযের পর বাড়ি ফিরে ৪ অথবা ৬ রাকআত নামায পড়ার হাদীস সহীহ নয়।

কোন কর্মে দ্বিধাগ্রস্ত হলে নিজ রবের কাছে পরামর্শ নিন এবং তার জন্য ইস্তিখারার নামায পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।

কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়লে অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার দরকার হলে স্বালাতুল হা-জাহ পড়ে আল্লাহর কাছে আবেদন জানান।

কোন পাপ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের জন্য স্বালাতুত তাওবাহ পড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান।

চন্দ্রে অথবা সূর্যে গ্রহণ লাগলে যথানিয়মে জামাআত সহকারে তার নামায পড়ুন।

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে যথানিয়মে জামাআত সহকারে স্বালাতুল ইস্তিস্কা পড়ে

আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন।

জুমআর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়ুন, সূরা কাহফ পড়ুন। সকাল সকাল গোসল করে মসজিদে উপস্থিত হন। নিয়মিতভাবে জুমআর নামায আদায় করুন। এই দিনে দুআ কবুল হওয়ার সময় খুঁজতে আল্লাহর ইবাদতে ও দুআয় মশ্‌গুল থাকুন। অবশ্য রুযী সন্ধানের প্রয়োজন থাকলে কাজে বেরিয়ে যান।

প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখুন।

প্রত্যেক হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ এই তিনদিন রোযা রাখুন।

যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।” *(বুখারী ১৯৭৯নং, মুসলিম ১১৫৯ নং)*

আবূ যার্র ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা রাখবে, তার সারা বছর রোযা রাখা হবে। আল্লাহ আযযা অজাল্ল্‌ এর সত্যায়ন অবতীর্ণ করে বলেন, কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে। *(সূরা আনআম ১৬০ আয়াত)* এক দিন ১০ দিনের সমান।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭০৮নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্‌কা দূর করে দেয়।” *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১০১৮নং)*

মুহার্রাম মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রাখার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে ৯ ও ১০ তারীখে আশূরার রোযা রেখে এক বছরের পাপ মাফ করিয়ে নিন।

শা’বান মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রাখার চেষ্টা করুন। রমযানের মাসের রোযা রাখার সাথে সাথে নিয়মিত তারাবীহ পড়ুন। বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি শবেকদরের রাত্রির খোঁজে শেষ দশকের সমস্ত বেজোড় রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করার চেষ্টা করুন। রমযানের পর শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখুন। আপনার সারা বছর রোযা রাখা হবে।

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যুল-হজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সর্বপ্রকার নেক আমল করার চেষ্টা করুন। এই নয় দিনে রোযা রাখুন। বিশেষ করে এ মাসের ৯ তারীখে আরাফার রোযা রেখে গত ও আগামী এক বছরের (সর্বমোট দুই বছরের) গোনাহ মাফ করিয়ে নিন। ১০ তারীখে সাধ্যমত কুরবানী করুন। ঈদের নামায পড়ে খুশী হন, অপরকে খুশী করুন।

খুব বেশী শক্তি থাকলে একদিন পর একদিন দাঊদী রোযা রাখুন। যৌন-পীড়ায় পীড়িত হলে রোযা রেখে তার উপশম খুঁজুন।

প্রত্যহ সামর্থ্য হলে কিছু না কিছু দান করুন। অন্নহীনকে অন্নদান করুন। অক্ষম ব্যক্তির সহযোগিতা করুন। এতীম-বিধবার খোঁজ খবর রাখুন। জানাযায় অংশগ্রহণ করুন। সামাজিক কাজ করুন। সৎকাজে আদেশ করুন ও মন্দ কাজে বাধা দিন।

বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝে সন্ধি স্থাপন করুন। যুলম থেকে বিরত রেখে যালেমের ও যুলম প্রতিহত করে মযলূমের সহযোগিতা করুন। নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, তা অপরের জন্য পছন্দ করুন। অপরের ত্রুটি গোপন করুন। অপরকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

বড়দের সম্মান করুন। আলেমদের শ্রদ্ধা করুন এবং তাঁদের পাশে বসুন। দৈনিক কিছু কিছু করে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করুন। সহীহ দলীল-ভিত্তিক আকীদা, ফারায়েয ও হারাম-হালাল শিখুন। বিদআত থেকে সুদূরে থাকুন। ইসলামী ক্যাসেট শুনুন। ইসলামী বই পড়ুন। হিকমতের সাথে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করুন। বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করুন। প্রত্যেক কষ্টে সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করুন। বিশ্বজাহানের মুসলিমদের জন্য দুআ করুন। জিহাদের সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুন।

সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আপনার মন আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাক। আপনার হৃদয় মসজিদের সাথে লটকে থাক। সংসারের কাজ থাকলে কাজ করুন। পিতামাতা ও স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করুন। আযান হলে আবার মসজিদে আসুন।

পিতামাতার হক আদায় করুন। আদায় করুন স্ত্রী-সন্তানের হক। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সাক্ষাৎকারীর হকও ভুলে গিয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবেন না। যেহেতু সেগুলিও তুলনামূলক বড় ইবাদত। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করতে হবে আপনাকে।

কোন কিছুতে অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জন প্রদর্শন করবেন না। খরচে কার্পণ্য ও অপচয় করবেন না। ব্যবহারে সুন্দর চরিত্র প্রকাশ পাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে।

নিম্নের কাবীরা গোনাহসমূহ হতে সাবধান থাকুন ঃ-

১। শির্ক (অতি মহাপাপ)
২। দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখা
৩। শরয়ী ইল্‌ম গোপন করা
৪। বিশ্বাসঘাতকতা করা
৫। গণকের কথা বিশ্বাস করা
৬। গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা
৭। গায়রুল্লাহর নামে নযর মানা
৮। গায়রুল্লাহর নামে কসম করা
৯। যাদু করা

১০। আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা
১১। মুসলিমের প্রতি কুধারণা রাখা
১২। মুসলিমকে বিনা দলীলে কাফের বলা
১৩। কাফেরকে কাফের না জানা
১৪। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা
১৫। আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা
১৬। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া
১৭। তকদীর অস্বীকার করা
১৮। তাবীয বাঁধা
১৯। প্রাণ হত্যা করা
২০। আত্মহত্যা করা
২১। যুলম করা
২২। অপমান ও অপদস্থ করা
২৩। মিথ্যা বলা
২৪। পরচর্চা বা গীবত করা
২৫। চুগলখোরী করা
২৬। গালি দেওয়া
২৭। মাদকদ্রব্য সেবন করা
২৮। মৃত বা হারাম পশুর মাংস খাওয়া
২৯। বাজে তর্ক করা
৩০। সত্য প্রত্যাখান করা
৩১। ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা
৩২। গালি দেওয়া
৩৩। অহংকার করা
৩৪। নিজের প্রশংসা নিজেই করা
৩৫। অপরের দোষ খোঁজা
৩৬। মূর্তি বা ছবি তৈরী করা
৩৭। এতীমের মাল ভক্ষণ করা
৩৮। জুয়া (ফ্লাশ) খেলা
৩৯। লটারী খেলা
৪০। চুরি করা

৪১। আমানতে খেয়ানত করা
৪২। পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা
৪৩। জমি-জায়গা দাবিয়ে নেওয়া
৪৪। ঘুস খাওয়া
৪৫। সূদ খাওয়া
৪৬। ওজনে নেওয়ার সময় বেশী এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া
৪৭। মিথ্যা কসম খাওয়া
৪৮। ধোকা দেওয়া
৪৯। কসম করে মাল বিক্রি করা
৫০। প্রতিশ্রুতি পালন না করা
৫১। চুক্তি ভঙ্গ করা
৫২। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া
৫৩। সাক্ষ্য গোপন করা
৫৪। মালে ভেজাল দেওয়া
৫৫। প্রয়োজনের সময় মাল গুদামজাত করে রাখা
৫৬। অসিয়ত পালন না করা
৫৭। আল্লাহর ভাগ করা ভাগ্যে সন্তুষ্ট না হওয়া
৫৮। পুরুষের সোনা ও রেশম ব্যবহার
৫৯। পুরুষের গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা
৬০। দান করে গেয়ে বেড়ানো
৬১। গান-বাজনা শোনা
৬২। ফরয নামায ত্যাগ করা
৬৩। সময় পার করে নামায পড়া
৬৪। লোক দেখিয়ে ইবাদত করা
৬৫। যাকাত না দেওয়া
৬৬। রোযা না রাখা
৬৭। হজ্জ না করা
৬৮। জিহাদ না করা
৬৯। জিহাদের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা
৭০। জুমআহ ত্যাগ করা
৭১। জামাআত ত্যাগ করা

৭২। সামর্থ্য থাকতে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজে বাধা না দেওয়া
৭৩। পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা
৭৪। ইল্ম অনুযায়ী আমল না করা
৭৫। ব্যভিচার করা
৭৬। মাসিক অবস্থায় সহবাস করা
৭৭। পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করা
৭৮। অবৈধ প্রেম করা
৭৯। সমকাম করা
৮০। হস্তমৈথুন করা
৮১। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া
৮২। মহিলার বেপর্দা হওয়া
৮৩। পুরুষের নারীর মত এবং নারীর পুরুষের মত বেশ ধারণ করা
৮৪। দাড়ি চাঁছা
৮৫। মা-বাপের অবাধ্য হওয়া
৮৬। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা
৮৭। স্বামীর কথা না মানা
৮৮। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া
৮৯। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া তালাক নেওয়া
৯০। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে হালালা বিবাহ দেওয়া ও করা
৯১। এগানা পুরুষ ছাড়া মহিলার একা সফর করা
৯২। পরের বাপকে বাপ বলা
৯৩। বাড়ির মহিলার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন (ভেঁড়া) হওয়া
৯৪। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া
৯৫। মহিলার ভ্রূ, মুখের লোম চাঁছা
৯৬। মহিলার পরচুলা ব্যবহার
৯৭। দেহ দেগে নক্সা করা
৯৮। দাঁত ঘষে ফাঁক ফাঁক করা
৯৯। কানাচি পেতে পরের গোপন কথা শোনা
১০০। শোকে মাতম করা

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিই যে, "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল পরহেযগারী।" *(সহীহুল জামে' ৩৩০৮নং)* "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল, যা (পালন করা) সহজ।" *(ঐ ৩৩০৯নং)* "সেই

(ধরনের) আমল আল্লাহর অধিক পছন্দনীয়, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৪২নং)*

আল্লাহর বান্দাদের নিকট পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন যে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো আমল করেছে। সুতরাং আমল যত বেশীই হোক, ভালো না হলে মূল্যহীন।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। যেহেতু আল্লাহ (সওয়াব দানে) বিরক্তিবোধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমলে) বিরক্তিবোধ করে বসবে।” *(সহীহুল জামে’ ২৭৪৭নং)*

“তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।” *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

“যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তার জন্মদিন থেকে নিয়ে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাটির উপর উবুড় করে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়, তবুও কিয়ামতের দিন সে তা তুচ্ছ মনে করবে!” *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৫২৪৯নং)* ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে নেক কাজ করার এবং বদ কাজ থেকে দূরে থাকার তওফীক দান করুন এবং ‘ইসলামী জীবনধারা’র উপর চলার প্রয়াস দান করুন। আমীন। অলা হাউলা অলা কুউঅতা ইল্লা বিল্লাহ।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.